ছোটদের শ্রেষ্ঠ লেখকের হাসির গল্প




ছোটদের
শ্রেষ্ঠ লেখকের
হাসির গল্প

ছোটদের

শ্রেষ্ঠ লেখকের হাসির গল্প

সুজিতকুমার নাগ
সম্পাদিত

নাথ ব্রাদার্স ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ
রথযাত্রা আষাঢ় ১৩৮৯, জুন ১৯৮২
দ্বিতীয় প্রকাশ
রথযাত্রা আষাঢ় ১৩৯৩, জুলাই ১৯৮৬

প্রকাশক
কে. নাথ/এস. নাথ
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ এঁকেছেন
কুমার অজিত

মুদ্রক
বীণাপাণি প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৭/১/এ সরকার লেন
কলিকাতা-৭

বারো টাকা





উপহার

....

....

....

এই প্রসঙ্গে

আমার সম্পাদনায় ইতিপূর্বে ছোটদের জগতে অনেক সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ছোটদের জগতে আমার সম্পাদিত সংকলন গ্রন্থগুলি জনপ্রিয় হয়েছে তা সকলের কাছে অজানা নয়। দীর্ঘকাল ধরে শিশু ও ছোটদের কিশোর সাহিত্যের নানা বৈচিত্র্যময় সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেছি। তারপর ছোটদের জগত থেকে অনেকের কাছ থেকে দাবী এলো হাসির গল্পের সংকলনের জন্য। আমারও অনেক দিন থেকেই পরিকল্পনা ছিল 'ছোটদের শ্রেষ্ঠ লেখকের হাসির গল্প' সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করি। যার ফলে আমার এই নবতম প্রচেষ্টা। ছোটরা কি পড়তে ভালবাসে, কি তারা চায়, কাদের লেখা চায় সেই সহজ কথাটি মনে করেই সেরা লেখকদের গল্পগুলি চয়ন করেছি। যাঁদের লেখায় এই সংকলন গ্রন্থখানি প্রকাশ করা সম্ভব হল, তাঁদের সকলের কাছে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই। নেপথ্য থেকে বন্ধুবর শ্রীক্ষিতিশ নাথ ও শ্রীসুভাষ নাথ যে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন তা ভুলবার নয়। প্রসঙ্গত শ্রীগৌর মোহন পানেরও নাম করছি। তিনি এই গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যাপারে অকৃপণ সহযোগিতা করেছেন। এই সংকলন গ্রন্থখানি যাদের জন্য প্রকাশ করা হল, তাদের ভাল লাগলেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

রথযাত্রা আষাঢ়, ১৩৮৯ **সুজিতকুমার নাগ**



সূচীপত্র



পালাবার পালা

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

আমার পাডার ছেলেরা অদ্ভুত !

গলির মধ্যে পথ জুড়ে ক্রিকেট খেলছে, পাশ কাটিয়ে পেরুবার চেষ্টায় আছি, তাদের ভিতর থেকে বলে উঠল একজন ঃ

'ধার দিয়ে যান।'

চমকে উঠলাম শুনে। থমকে দাঁড়াতে হোলো আমায়।

'সে কি !' আমি বললাম ঃ 'এইতো সেদিন তোমাদের স্বরস্বতী পূজোর চাঁদা দিয়েছি—এর মধ্যেই আবার ধার চাইছো যে ?'

সেকথার জবাব না দিয়ে ছেলেটি বলল ঃ 'পূজাকমিটির ভাইস প্রেসেডেণ্ট হয়েছেন, চাঁদা দেবেন না ? বারে, প্রেসিডেণ্ট কত দিয়েছেন জানেন ?'

'প্রেসিডেণ্ট না হয়ে যে ভাইস করেছি তার জন্যে অত টাকা চাঁদা ? পাঁচ পাঁচ টাকা ? বলো কি হে ? পাঁচ টাকা যে আমাকে বেচলেও পাওয়া যায় না।'

'প্রেসিডেণ্ট যে দশ টাকা দিয়েছেন মশাই।'

'ভাইস প্রেসিডেণ্ট হয়ে আমার লাভ ?'

'আসছে বছর আবার আপনি ভাইস হবেন আমার পাঁচটাকা চাঁদা দিতে পারবেন।'

'এমনি আমার পাড়ার ছেলেরা। কেমন জলের মত সব পরিস্কার করে দেয়—হেঁয়ালীর মতর রহস্যকেও !

তারাই এসে ধরল সেদিন আমায়—পাড়ার রবীন্দ্রজয়ন্তীর সভায় পৌরহিত্য করতে হবে।

সভার নাম শুনলেই আমি ভড়্কাই। বক্তৃতা করতে পারি না, আর তা শুনতেও আমার কষ্ট হয়। সভায় যেতে হলে, যদি নিতান্তই যেতে হয়, আমি অতি সভয়ে যাই। আমার পেট কামড়ায়, হাত পা কাঁপে। বুক গুড়গুড় করে। প্রায় কলেরার মতন দাঁড়ায়।

'পৌরহিত্য করবার আমি কে ?' বললাম আমি তাদের ঃ 'পাড়ায় কেউ পৌরপিতা নেই ? তাঁদের কাউকে নিয়ে যাও পাকড়ে। পৌরের হিত বলো অহিত বলো—করবে তাঁরাই।'

'বারে ! আপনি যে রবীন্দ্রনাথের বরপুত্র....'

'কে বললে ? আমি তাঁর বড় মেজ সেজ ছোট ন' ফুল রাঙা কোন পুত্রই না—পোষ্যপুত্রও নয়। এমন কি ত্যাজ্যপুত্রও নই। তা ছাড়া, আসল কথা, বক্তৃতা আমার আছে না।'

আসল কথাতেই আসলাম আমি। এমনি বসে বসে আমি বেশ আড্ডা জমাতে পারি, খোসগল্পে মসগুল হতে পারি খাসা, কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে হলেই আমার হয়েছে ! ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি—এই কাণ্ড। ক্লাসরুমে বসে থাকতে যেসব জবাব আমার ঠোঁটে লেগে থাকত—চোটপাট চলে আসত মাথায়, মাস্টার মশাই তার কোনটা জিগ্যেস করলে তার উত্তর দিতে দাঁড়াতে গিয়েই দেখেছি সেসব সদুত্তর কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। পায়ের নোখ খুঁটেও পাইনে কড়িকাঠ খুঁজেও পাওয়া যায় না। তখন, তারপরে, আমাকে বাধ্য হয়ে আরও উপরে উঠে দাঁড়াতে হয়েছে। বেঞ্চির উপরে।

'আমায় নিয়ে যেয়ো না।' আমি সকাতরে অনুনয় করলাম—'আমি বলতে শুরু করলেই তোমরা আমায় দূর দূর করবে। আমার সেই দুর্গতির কথা ভেবেই আমি ডরাই।'

বলা কওয়ার ব্যাপারে স্বভাবতই আমি দুর্বল। আমি মোটেই বলিয়ে কইয়ে নই। বলতে উঠে বলবার ভাষা খুঁজে পাই না, আর

রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন এমন একটা বিষয় যা এক মুখে নয় একশো মুখে বলবার। এবং একশ বছর ধরে একশো মুখে বলেও যাঁর মহিমার কণামাত্রও প্রকাশ করা যাবে না, তা আমি আমার এই সামান্য একমুখে, যে মুখ আবার একও নয় নিতান্তই শূন্য, কি করে বিশদ করব।

'দ্যাখো ভাই, সভায় যেতে আর কি, চলৎশক্তি থাকলেই যাওয়া যায় কিন্তু বলৎশক্তি না থাকলে তো কিছু বলা যায় না····' আমি বলতে যাই।

'আপনার বক্তৃতা আপনি মুখস্থ করে নিয়ে যাবেন। গড় গড় করে আউড়ে দেবেন সেখানে। তাহলেই হবে।' এই বলে তারা চলে গেল।

যেতে হল সভায়।

পাড়ায় বেপাড়ার ছেলে মিলে বিরাট জমজমাট সভা।

যথাসময়ে সুরু হোলো আমার বক্তৃতা : ঝাড়া একটানা একখানা :

'রবীন্দ্রনাথ যে কতবড় কবি ছিলেন তাহা আমরা আগে জানিতে পারি নাই দাঁড়ি আছে····পরে যখন তিনি নোবেল প্রাইজ পাইলেন তখন আমরা সকলেই জানিলাম কমা আছে কমার উপর ফুটকি আছে····'

বেশী নয় এইটুকুই মাত্র এগিয়েছি—সভায় ভীষণ সোরগোল উঠল। থামুন থামুন! খুব হয়েছে বসে পড়ুন বসে পড়ুন।' হট্টগোল উঠল চারিদিক থেকে।

কাছের একটা ছেলেকে বলতে শুনলাম—'আমাদের আদর্শ রচনার বই থেকে টুকলিফাই করে বলে যাচ্ছে মাইরি! কমা সেমি-কোলন কিচ্ছু বাদ না দিয়ে। এ আর কি শুনব ভাই!

হাঁফ ছেড়ে আমি বসলাম।

'আমি তো জানতাম পাড়ার ছেলেরা কেউ পড়াশোনা করে না।' পাশের ছেলেটিকে বললাম : 'তোমরা যে মন দিয়ে বই পড়ো, আবার

সেই পড়া মনে করে রাখো তা কি করে জানব ! তাহলে আমি অন্য পাড়ার থেকে অন্য এক আদর্শ রচনা মুখস্ত করে আসতাম ।"

'এ বছরের পরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথের রচনা আসবে কি না। বলে দিয়েছেন স্যার।' জবাব দিল ছেলেটি : 'তাই আমরা সবাই খুব করে কসে ওটা মুখস্ত করে রেখেছি। আপনি যদি মাইকেল কি নেতাজীর রচনা ঝাড়া মুখস্ত বলতেন তাহলে আমরা কেউ ধরতে পারতুম না—কেই কিছু বলতেও যেতুম না।'

তা বটে ! গোড়াতেই গলদ হয়েছে। যা হবার হয়ে গেছে আর কি করা ? এখন কোনো রকমে ফাঁড়াটা কাটল সেই রক্ষে !

তারপরই পাড়ার খবরটা আমি কাগজে ছেপে বার করে দিয়েছি —এই আশায় যে এর পরে, এমন কেলেঙ্কারির পর, আর কেউ আমায় কোন সভায় ডাকবে না।

কিন্তু না, বৃথা আশা ! তারপরেও ডাক এলো।

বনগাঁ না বনহুগলি কোথা থেকে ছেলেরা এলো জীপ নিয়ে....

আমি বললাম—না না। আমি সভাপতি হতে পারব না....

'সভাপতি কেন, আপনি তো প্রধান অতিথি। সভাপতি হবেন স্থানীয় এক অধ্যাপক।' জানালো তারা।

'প্রধান অতিথি ?' প্রধান অতিথির কাজ কি তা জানো ?'

'কি কাজ ?'

'মুখের কাজ। কিন্তু সে কাজ মুখর কোনো কাজ নয়। যা বলবার সভাপতিই বলবেন, ভাষণ টাষণ যা দেবার তিনিই দেবেন সব। প্রধান অতিথি মুখ খুলবে না একদম। মুখ খুলবে খালি খাবার সময়। তারপর মুখ না খুলে সে নিজের কাজ করে যাবে—মুখটি বুজে চুপটি করে।'

'সে আবার কি।'

'সে আবার কি।' শুনে আমি অবাক হই। —'অতিথির কি কাজ তাও কি জানো না। তার হচ্ছে খাবার কাজ। অতিথি

সংকার কথাটা কি শোনোনি কখনো ?"

'বেশ তো ! খাওয়াবো আপনাকে খুব। চলুন না!' তারা বলল : 'বনগাঁর তিন ভাগ বন। আর বনের ভেতর পাঁচ ভাগ আম গাছ। আম ফলেছে বেজায়।'

লঙ্কায় আম আছে না জেনেই হনুমান লাফ দিয়েছিল, আমের খবর পেয়ে লাফ দিলে, আমার অনুমান, সে লঙ্কা ডিঙিয়ে চলে যেত।

আমিও আমার পাড়ার সভার ইতিহাসকে ডিঙিয়ে চলে গেলাম।

গিয়ে দেখি সভাই বটে, তবে শ্রোতার চেয়ে ভলান্টিয়ারের সংখ্যা বেশি। প্রায় সবার বুকেই একটা করে ব্যাজ আঁটা, আর যারা ব্যাজ পায়নি তারা রঙীন ফিতে ঝুলিয়েছে গলায়। ভারী সঙ্গীন ব্যাপার !

সভা কিন্তু আর বসে না। সভাপতির আসবার দেরি হচ্ছে। পরে জানা গেল, অধ্যাপকমশায় বক্তৃতা দেবার লোভে কলকাতার এক সভায় গেছেন, আজ আর ফিরবেন না ! অতএব···

অতএবটা, ব্যাজ আঁটা ছেলেরা এসে জানিয়ে দিল। প্রধান অতিথি আর সভাপতির দুটো কাজই আমায় সারতে হবে। মুখরতা আর মুখের ওটা !

শুনে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ।—'এক গেলাস জল দাও আমায়····' আমি চিঁ চিঁ করলাম

একটা ফিতে-আঁটা ছেলে ছুটে গিয়ে এক গেলাস জল এনে দিল তক্ষুনি।

'শুধু জল দিলে ?' শুধু জল দেয় নাকি ? তা কি দিতে আছে ?' আমি কাতরস্বরে কইলাম।

'আপনি জলই তো চাইলেন।' বলল ছেলেটি—একটু অবাক হয়েই।

তা বটে ! জলই চেয়েছি বটে। কিন্তু জল চাইলে তার সঙ্গে আরেকটা কথা যে উহ্য থেকে যায়। তা কি এই ছেলেটা জানে না।

জলের সঙ্গে স্থলও দিতে হয় যে। ভগবান আমাদের দুনিয়ার মানুষকে তিন ভাগ জল দিয়েছেন কিন্তু তার সঙ্গে স্থলভাগও তিনি দেন নি কি? জলেস্থলে একাকার করে দিয়েছেন একেবারে।

'তোমাদের এখানকার কোন খাবার বিখ্যাত?' শুধালাম ছেলেটিকে।

'আজ্ঞে....?'

'মানে, এই যেমন বর্ধমানের সীতাভোগ, জনাইয়ের মনোহরা, দিল্লীর লাড্‌ডু তেমনি বনগাঁর কোন খাবার নামজানা?

'বনগাঁর শোন-পাপড়ি।' সে জানাল।

'সেই শোন-পাপড়ির দোকানটা একবার দেখিয়ে দেবে? তোমাকেও খাওয়াবো একটু না হয়।'

'না। তা পারব না। আপনাকে সবাই আমরা গার্ড দিচ্ছি। যাতে আপনি পালিয়ে না যেতে পারেন। আপনি বক্তৃতার ভয়ে সভ্য থেকে পালিয়ে যান বলে ককটা গল্প লিখেছিলেন আমরা পড়েছি। সেই জন্যেই সতর্ক রয়েছি সবাই।'

'ও বাবা! তাই না কি? তা হলে ত ভারী মুস্কিল।

আপনাকে খাওয়াবো শোন-পাপড়ি। আম-টাম অনেক রকম খাওয়াবো। আপনার ভাষণ দেবার পরেই, বুঝেছেন? বক্তৃতা না করলে খেতে দেবে না। আগে বক্তৃতা তারপর....'

'আহা, তাতে কি হয়েছে? একটুখানি চলো না সেই দোকানটায়। খিদে পেয়েছে কি না! কিছু না পেটে পড়লে কথাই বেরুবে না যে। তুমি তো গার্ড, তুমি তো আমার সঙ্গেই রইলে। পাহারা দিতে দিতে যাবে। তোমার সঙ্গে কি আমি দৌড়ে পারব? যদি পালাই তাহলে আমার ঠ্যাং ভেঙে দিয়ো। পাহারাদারের সঙ্গে দৌড়াতে গিয়ে কে নিজের পা হারায়? আমরা কেবল সেই দোকানে যাব, যাব আর খাব, খাব আর আসব। আমি যদি দুটো খাই তুমিও দুটো, আমি চারটে খেলে তুমিও চারটা, আমি আটটা খেলে....

'যেতেই দেবে না। অন্য গার্ডরা দেখতে পাবে ত। সবাইকে কি আপনি খাওয়াতে পারবেন ?'

'রাস্তার ধার দিয়ে না গিয়ে যদি প্যাণ্ডেলের এধারটা দিয়ে যাই ?'

'ওধারে ত জঙ্গল !'

'জঙ্গল !' শুনে আমি চমকে উঠি : বাঘটাঘ নেই তো ?'

'থাকতেও পারে। একবার একটা সার্কাসের বাঘ খাঁচার থেকে ছাড়া পেয়ে ওই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল তাকে আর ধরা যায় নি। তারপর থেকেই ওই জঙ্গলের পথ দিয়ে কেউ আর সহজে হাঁটে না। ওর ভেতর দিয়ে ইষ্টিশনে যাবার শর্টকাট ছিল।'

সন্ধ্যের আগে ঝড় উঠলো হঠাৎ—কাল বোশেখীর ঝড় ! এদিকে আমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি চলছে ওদিকে এখন প্যাণ্ডাল নিয়ে টানাটানি পড়ল। সবাই প্যাণ্ডাল নিয়ে পড়ল, তাকে খাড়া রাখতে উঠে পড়ে লাগল সবাই—সেই ফাঁকে আমার ফাঁড়া কাটবার সুযোগ এল।

সবার অলক্ষ্যে জঙ্গলের পথ ধরে আমি সটকালাম।

হন হন করে চলেছি, একটু ভয়ে ভয়েই বলতে কি ! যদি সেই উপোষী বাঘটা হন্যে হয়ে হাজির হয়।

বাঘ না হাতী ! মিথ্যে ভয় দেখিয়েছিল ছেলেটা। বনগাঁয় তো শেয়াল রাজা বলেই জানি।

কিন্তু না, খানিক যেতেই—হালুম ! হাড়ে হাড়ে মালুম হল। হাড়গোড় শিরদাঁড়া কেঁপে উঠল আমার। বাঘ মশাই এক লাফে সামনে এসে খাড়া হলেন।

'হাঁউ মাঁউ খাউ মনিষ্যির গন্ধ পাঁউ !' বলল বাঘটা : 'অনেকদিন ভালোমন্দ কিছু পেটে পড়ে নি ! আজ তোমায় পেয়েছি ছাড়চি না....'

'বেশ ত। খাবে তো ভালো কথাই !' আমি বললাম : 'কিন্তু একটা কথা আছে। এই বনে তুমি এখন প্রধান অতিথি। অতিথি

সৎকারে আমি প্রস্তুত। কিন্তু একটা কথা আছে। আগে তোমাকে প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে হবে তার পরে খাবার কথা। তার আগে কিছুতেই খেতে দেওয়া হাব না।'

'প্রধান অতিথির ভাষণ ?'

'হ্যাঁ, খাবে যে, তার বক্তৃতা তৈরী আছে ? খাবার আগে তোমায় বক্তৃতা দিতে হবে একখানা, ঝাড়া এক ঘণ্টা, একটানা। পারবে বক্তৃতা দিতে ? পারলে খাও। তোমার পেটে গিয়ে আমি কৃতার্থ হব। একজন প্রধান অতিথিকে খেয়ে ডবোল প্রধান অতিথি হয়ে তুমিও ধন্য হবে।'

শুনে বাঘটা ছ'পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালো, বক্তৃতা দেবার চেষ্টাতেই বোধ হয়।

তারপর মাথা চুলকালো, ভুঁড়ি আঁচড়ালো, নিজের দুগাল খামচালো কিন্তু একটা কথাও বেরুলো না তার মুখ দিয়ে। তারপর আর কিছু না বলে লেজ তুলে লজ্জায় সে দৌড় মারলো সটান।

ঠিক আমি যেমন পালাচ্ছি।

———

পূজোর ছুটিতে বেড়ানো

প্রেমেন্দ্র মিত্র

এবারে প্রায় বেরিয়ে পড়েছিলাম বললেই হয়। বলাই বাহুল্য, পূজোর ছুটিতে বেরিয়ে পড়ার কথা বলছি।

ছুটিতে বেরুবার উদ্যোগ-আয়োজন কোন্ বছর আর না-করি, কিন্তু অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারে বেশ কিছুটা আশাপ্রদ ঝিকিমিকি দেখা গেছল উদ্দেশ্যসিদ্ধির।

না, লাগেজে বাঁধা-ছাঁদা কি ট্রেনে উঠে বসা অবশ্য হয়নি, তবে সবচেয়ে কঠিন কাজটাই সেরে ফেলেছিলাম।

মানে, কোথায় যাওয়া হবে, সেইটাই আশ্চর্যভাবে ঠিক হয়ে গেছল।

ছুটিতে কোথাও বেরুতে হলে গন্তব্যটাই যে আসল, এই রূঢ় সত্যটাই অনেকে আমরা ভুলে যাই। অনেকেরই ধারণা, গন্তব্য একটা ঠিক করলেই হ'ল। ওতে আর কি হাঙ্গামা!

কিন্তু যাওয়ার চেয়ে যাওয়ার ঠিকানা বার করা যে অনেক কঠিন, তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন।

আমার এই চার বৎসরের অভিজ্ঞতাই ধরা যাক্ না কেন?

তের শ' পঁয়ষট্টি থেকে এ বিষয়ে পাকা বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে।

পঁয়ষট্টির রোজনামচার খাতায় দেখছি, দুইটি টাইম-টেবল কেনার কথা রয়েছে। মহালয়া পর্যন্ত যা-যা আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, তারও সারাংশ পাচ্ছি। আগ্রা, মথুরা না অজন্তা ইলোরা,

এই নিয়ে মতভেদ প্রচণ্ড তুফানরূপে মহালয়া পার হয়ে গিয়ে সহসা কুমারিকার নামে শান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের রেলের টাইম-টেবল তখন দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় সব গেছে ভেস্তে।

ছেষট্টিতে মহালয়ার আগেই মূল সমস্যা মিটে গেছে। ঠিক হয়েছে রাঁচিই যাওয়া হবে। কিন্তু মোটরে না ট্রেনে? মীমাংসা হবার আগেই দেবী দশভুজা অশ্বে না গজে কৈলাসে ফিরে গেছেন।

সাতসট্টিতে স্বাধীনতা দিবস থেকেই বিচার-সভা বসান হয়েছে। সঙ্গে অল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে গাইড আর ব্রাড্-শ। ফলে গন্তব্য স্থান আর স্থির করা যায়নি। সমুদ্র ও পাহাড়ের, নদী আর অরণ্যের, মানুষের কীর্তি আর প্রকৃতির অকৃত্রিম শোভার মধ্যে বাছাই করতে না পেরে বিবাদ প্রায় বিচ্ছেদে পৌঁছবার উপক্রম করেছে।

আটষট্টিতে সবদিক দিয়েই শুভলক্ষণ দেখা গেছে গোড়া থেকেই।

এবারে বুঝে সুঝে টাইম-টেবল এনেছি ঠিক পয়লা অক্টোবর।

দোসরা তারিখে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সন্দেহ-দোলায় দুলেছি। ওয়ালটেয়ার না দ্বারকা?

তেসরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছি উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে। নৈনিতাল না ধনুষকোটি?

চৌঠো সব হাঙ্গামা চুকিয়ে একেবারে মধ্যমণি রাজধানীর ওপরেই মনঃস্থির করেছি।

সকাল বেলা টিকিট কাটতে দেবার জন্য টাইম-টেবলটা সবে ওল্টাচ্ছি, এমন সময় সঙ্কটমোচন, বিপদভঞ্জন, পরম পরামর্শ-বিশারদ শিবু এসে হাজির।

টাইম-টেবলটা তাড়াতাড়ি লুকোতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার শ্যেন-দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেলাম।

আবার? আমার ওই সব ঘাঁটছ?—শিবুর গলায় তীব্র ভর্ৎসনা।

ঠিক যেন কোন অশ্লীল আজগুবি নোংরা বই পড়ছিলাম, এমনি

অপরাধীর মত কুণ্ঠিতভাবে জানাতে হ'ল—না, এই দিল্লি কোন্ ট্রেনে গেলে সুবিধে হয়, তাই দেখছিলাম।

তুমি দিল্লি যাবে? ওই পূজোর সময়? এই পূজোর সময় কেউ কোথাও যায়?- শিবু আমার মূর্খতায় স্তম্ভিত।

বললাম—ত যায় বলেই ত মনে হচ্ছে। নইলে টিকিটের জন্যে এত মারামারি কিসের।

ও মারামারি করছে আহাম্মুকেরা! শিবু সোজা রায় দিলে—আর সেই আহাম্মুকদের ভিড়ে কোথাও গিয়ে সুখ আছে!

আমায় নীরব দেখে শিবু বোঝাতে বসল এবার—তোমার দিল্লি যাওয়াটা কি রকম হবে একবার ভেবে দেখেছ? প্রথমত, যাবার সময়, নির্ঘাত বৃষ্টি হবে। হবেই জানে। হাওয়া আপিসের চেয়ে নির্ভুল এ-গণনা। পূজোর সময় ট্রেনের টাইম বুঝে বৃষ্টি হওয়া অবধারিত। তারপর ট্যাক্সি পাবে না ঠিক সময়ে। লোকবল যদি তোমার না থাকে, মালপত্র বেঁধে-ছেঁদে ট্যাক্সির খোঁজে মোড়ে মোড়ে ছুটোছুটি করবে। ভাগ্য যদি নেহাত ভালো হয়, তাহলে শেষ মুহূর্তে হয়ত একটা পাবে। সেটা ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে কি হ্যারিসন রোডে ট্রাফিক জ্যামে জমে যাবে। পূর্বজন্মের পুণ্যফল যদি থাকে, তাহলে এক মিনিট থাকতে স্টেশনে গিয়ে পৌঁছবে। সেখানে কুলির তখন দুর্ভিক্ষ, মাল তোলার আগে মাথায় পাগড়ি বাঁধতেই তার অর্ধেক রাজত্ব চাইবে! তারপর মালপত্র নিয়ে প্ল্যাটফর্মের ঘুরঘুরে গেট দিয়ে ঢুকতে কার তোরঙ্গ, কার সুটকেসে ধাক্কা খেয়ে কপাল, মাথা ফুলিয়ে ট্রেনের কামরায় গিয়ে যখন পৌঁছবে, তখন দেখবে যারা পৌঁছাতে এসেছে, তাদের ভিড়ই কামারায় তিলধারণের জায়গা নেই। কোথায় তখন বসবে, কোথায় মাল রাখবে, ঠিক করতে করতেই ঘণ্টা বেজে যাবে। মালপত্র, এমন কি, তুমি নিজেই সশরীরে পৌঁছেছ কিনা, তোমার সন্দেহ হবে····

শিবু একটু দম নেবার জন্যে থামতে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম, তার

সদুপদেশে অতিষ্ঠ হয়ে—কিন্তু তার পরে ভাবো দেখি। এক-এক করে সব পৌঁছোতে-আসল ফালতু লোক নেমে যাবে। যদি দিনের বেলা হয় ত ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আলোয় ভেসে যাবে কামরা, আর রাত্রি হলে প্ল্যাটফর্ম ছাড়াবার পরই প্রথমে চারিদিকে রেলপথের অসংখ্য আলোর যেন দেওয়ালীর উৎসব। সেই উৎসব ছাড়িয়ে মিষ্টি গাঢ় অন্ধকার····

শিবু ঝট্‌ করে গলা বাড়িয়ে দিলে একটু ফাঁক পেতে না পেতে ····কিন্তু কামরাটার কথা ভাবো একবার। যে ক্লাসেই যাও যত সব বেয়াড়া, বিদঘুটে সহযাত্রী, হয় একপাল ছেলে মেয়ে নিয়েই চ্যাঁ-ভ্যাঁ, নয় ভুঁড়িদাস কোন ভোম্বল বাহাদুরের গরম পয়সার অভব্য ঝন্‌ঝনানি····

শিবুকে ওই ঝন্‌ঝনানির মধ্যে রেখে আমি ধরলাম—কিন্তু সবাই ত ভুঁড়িদাস ভোম্বল বাহাদুর নয়, এই ট্রেনে যেতেই কত অদ্ভুত চমৎকার মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়, জীবনে যাদের সঙ্গে দেখা হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। আর এই ভিড়ের মধ্যেই মানুষের নির্ভেজাল চেহারাটা পাওয়া যায়····

এমনি করেই সারা সকালটা আমাদের চিতেন পরচিতেন চলল। আমি থামি ত সে ধরে। সে থামে ত আমি ধরি। কেউ কাউকে ছেড়ে কথা কয় না। মেজাজ পরস্পরের ক্রমশঃ চড়ছে সপ্তমে।

শেষ পর্যন্ত রেগে আমার টাইম-টেবলটাই কেড়ে নিয়ে শিবু যখন চলে গেল, তখন আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না। শিবুও তথৈব চ।

শিবুকে যে সব বাছা বাছা যুক্তি সময়মত মনে পড়লে শোনানো যেত, সেদিন দুপুরটা সেইগুলো ভাবতে ভাবতে কেটে গেল। বিকেলে রাগ করেই বাড়ি বেরুলাম না পাছে শিবুর সঙ্গে দেখা হয়।

পরের দিন সকালবেলা কিন্তু আকাশের মনটাও প্রসন্ন হয়ে গেছে দেখলাম। অনেক রাত পর্যন্ত শিবুর যুক্তিগুলো খণ্ডন করবার

পাঁয়তারা মনে মনে করেই বোধ হয় এমনটা হয়েছে।

সত্যি শিবু কথাগুলো মন্দ বলেছে কি? তার যুক্তিগুলো ক্রমশঃই যেন অকাট্য মনে হচ্ছে। এক হিসেবে হড়বড় করে কাল টিকিট কিনতে না দিয়ে ভালোই করেছি। এই পূজোর ভিড়ে বেড়াতে যাওয়া মানে ময়দাঠাসা হওয়ার কোন মানেই হয় না।

সুপরামর্শ দিয়ে আমার নাকাল হওয়াটা যথাসময়ে নিবারণ করবার জন্যে শিবুকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসাটা উচিত মনে হ'ল।

সকালের কাজকর্ম সেরেই তার মেসে গিয়ে হানা দিলাম।

কিন্তু শিবু গেল কোথা!

তার মেসের ঘরের দরজা দিনরাতই হাট। তার সেই নড়বড়ে তক্তপোশ, ভাঙা আলনা, ঘরময় ছেঁড়া কাগজ, সবই ঠিক আছে। শুধু শিবুই নেই।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি অবাক হয়ে, এমন সময় শিবুর মাসতুতো ভাই গৌরের সঙ্গে দেখা।

আমি শিবুর কথা জিজ্ঞাসা করব কি, গৌর আমাকে দেখেই প্রায় মারমুখো!

কি সব ফুসমন্তর দিয়েছেন বলুন ত শিবুদাকে? লোকটা একেবারে তিড়বিড়িয়ে বেরিয়ে গেল আমাদের গ্রাহ্য না করে!

কে গেল? শিবু? কোথায়? আমি হতভম্ব।

তা আমরা কি জানি? কাল বিকালেই একটা সতরঞ্জিতে ছুটো ধুতি-পাঞ্জাবি আর গামছা জড়িয়ে বাসে করে হাওড়ায় ছুট। আপনার কাছে কি শুনে শিবুদা সার বুঝেছে যে, পূজোর ভিড়ে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে না বেড়ালে নাকি বেড়াবার কোন মানেই হয় না!

———

দান-বীর

জরাসন্ধ

ট্যাংরাখোলার বাজারে একখানা ছোট-খাটো "বাজে মালের" দোকান। বাপের আমল থেকে ঐটুকুই গণেশ পালের সম্বল। কোন রকমে সংসার চলে। অর্থাৎ চলে না বললেই চলে। তখন যুদ্ধের বাজার। কাপড়, চাল, কেরোসিন জোটাতেই প্রাণান্ত। হঠাৎ একদিন শোনা গেল—মিলিটারি এল। নদীর পারের সমস্তটা মাঠ জুড়ে আমেরিকানদের ছাউনি পড়ল। তাদের রাক্ষুসে চাহিদা মেটাবার জন্যে দালাল, ফড়ে আর ঠিকাদারে বাজার ছেয়ে গেল। যত ছিল বেকার লোক, তাস পিটে আর তামাক টেনে দিন যেত, কাজ জুটে গেল সবাকার। সবারই হাতে চকচকে নতুন নোট।

গণেশও গিয়ে ধরল ওদের বড়বাবুকে—একটা কনট্রাক্টারি চাই।

"তুমি পারবে? পুঁজি আছে কিছু?"—বড়বাবু হেসে বললেন।

"আজ্ঞে, পুঁজি অতি সামান্যই। ছোট-খাটো অর্ডার পেলে দিতে পারব।"

"ছোট-খাটো আর কীই বা আছে? আচ্ছা, ঝ্যাঁটার অর্ডারটা নিয়ে যাও। এক হাজার ঝ্যাঁটা চাই, সাতদিনের মধ্যে; প্রত্যেকটা আড়াই সের।"

ঝ্যাঁটা! গণেশ পালের মনটা দমে গেল। লোকে বলবে 'ঝ্যাঁটাওয়ালা'।

কিন্তু টাকা যখন চাই, অত বাছ-বিচার করলে চলে না! অনেক ভেবে গণেশ রাজী হল। নৌকো, গরুর গাড়ি আর লোকের মাথায়

চড়ে দুনিয়ার ঝাঁটা এসে জড় হল তার বৈঠকখানায়। ছেলেরা নাক সিটকায়; গিন্নী তো রেগেই আগুন—"খেতে না জোটে ভিক্ষে কর। এ সব অলক্ষুণে কাণ্ড কেন বাপু।"

দত্তমশাই মুরুব্বি লোক; বাড়ি বয়ে বলে গেলেন, "কি হে গণেশ, শেষকালে তোমার কপালে জুটলো ঝাঁটা?"

যে যাই বলুক, ঝাঁটার থেকেই গণেশের কপাল ফিরে গেল। ঝাঁটার পরে ঝুড়ি, এবং তার পর বছর না যেতেই টাকাও আসতে লাগল ঝুড়ি ঝুড়ি। গণেশ পালের ব্যাঙ্কের জমা লাখ ছাপিয়ে উঠল।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। ট্যাংরাখোলার বাজারে সবচেয়ে বড় আড়ত গণেশ পালের। জেলার সদরে উঠেছে তিনতালা। এখন সেখানেই সে থাকে! বাইরেটা তেমনি আছে। সেই আধ-ময়লা ফতুয়াটা এখন ঝুলে একটু বেড়েছে। গণেশ তার নাম দিয়েছে হাফ-পাঞ্জাবি। সাবেকী আমলের বৈঠকখানা। ঘরজোড়া তক্তপোশ; তার ওপরে শীতলপাটি। ঠিক সামনেটায় একটা কাঁচের আলমারী, তার ভেতরে একখানা মস্ত বড় ঝাঁটা। সেখানে দাঁড়িয়ে গণেশ নিজ হাতে ধুপ-ধুনো দেয় সকাল-সন্ধ্যা। কেউ যদি প্রশ্ন করে—"আলমারিতে ঝাঁটা কেন?" গণেশ কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে, "আজ্ঞে, ঐ রূপেই মা-লক্ষ্মী আমার ঘরে এসেছেন।"

ছেলেমেয়েরা ইস্কুল-কলেজে পড়ে। বড় ছেলে তো কথাই কয় না বাপের সঙ্গে। মেয়ে মাঝে মাঝে বলে—"বাবা, ঝাঁটাটা সরিয়ে ফেল। লোকে হাসাহাসি করে।"

গণেশ জিভ কেটে বলল—"সর্বনাশ! বলিস্ কি তোরা?

টাকা যেমন বাড়ল, তার সঙ্গে বেড়ে চলল উমেদার ও দাবিদারের দল। পাড়ায় ঘটা করে সার্বজনীন দুর্গা পূজো হবে। গণেশের নামে চাঁদা পড়ল পাঁচ-শ টাকা। পূজো-কমিটির প্রেসিডেন্ট নিজেই এলেন আদায় করতে। অনেক আদর-আত্তি, খাতির সমাদরের সঙ্গে গণেশ এগিয়ে দিল একখানা পাঁচ টাকার নোট। প্রেসিডেন্ট চোখ রাঙিয়ে

বললেন—"আমাদের সঙ্গে তামাসা করছেন ?"

গণেশ জিভ কেটে মাথা নেড়ে বললে—"ছি-ছি-ছি! আপনারা হলেন মানী লোক। তামাসা করা কি আমার সাজে ?"

পূজো-কমিটি রেগে শাসিয়ে বেরিয়ে গেল। এমনি করেই আর একদিন ফিরে গেল কাত্যায়নী থিয়েট্রিকাল পার্টির ম্যানেজার। গণেশ তাদের জন্য বরাদ্দ করেছিল পাঁচ সিকে।

মেয়েদের মাইনর স্কুলকে হাই স্কুলে দাঁড় করাতে হবে। হেড মিস্ট্রেস্ সুমিতা দেবী এসে সাহায্য চাইলেন। পাল ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠল। একবার বসে, তিনবার দাঁড়িয়ে, পাঁচবার নমস্কার করে মাথা চুলকে, বের করল দশ টাকার একটা নোট। সুমিতা চোখ কপালে তুলে বললেন—"এ কি করছেন ? আমি যে অন্ততঃ হাজার খানেক টাকার আশা নিয়ে এসেছিলাম পালমশাই !"

গণেশ একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে বলল—"আমি নগণ্য লোক ; আমাকে অমন ঠাট্টা করলে বড্ড লজ্জা পাই।"

এর পর থেকে গণেশের নামের আগে-পিছে পাড়ার ছেলেরা যে সব বিশেষণ বসাতে লাগল, সেগুলো আর এখানে বলা চলে না।

গণেশের পিসতুতো শ্যালক—ভুজঙ্গভূষণ। ভারী ভাব দু'জনের। বয়সের তফাত অনেক—ছাপান্ন আর ছাব্বিশ। কিন্তু মনের কথা চলত তারি সঙ্গে। ভুজঙ্গ ছিল খবরের কাগজের রিপোর্টার। নানা জায়গায় ঘুরে টাট্‌কা আর মুখরোচক খবর তৈরি করাই ছিল তার পেশা। রিপোর্টার কথাটা সে পছন্দ করত না, নিজেকে বলত জার্নালিস্ট। মাঝে মাঝে গণেশের বাড়ি এলে বেশ কিছুদিন আড্ডা জমত।

সেবার শহরে লাগল ভোট-যুদ্ধ। আইন-সভার সভ্য নির্বাচন হবে। একদিকে দাঁড়িয়েছেন জেল-ফেরৎ দেশসেবক জগৎনারায়ণ। আর একদিকে জবরদস্ত জমিদার শিবেশ চৌধুরী। গালাগালি, লাঠালাঠি আর গরম বক্তৃতায় শহর একেবারে সরগরম। এমন সময়

ভুজঙ্গ এসে হাজির।

"কি খবর? অনেক কাল যে দেখা নেই!"—গণেশ জিজ্ঞেস করল।

—"কত দেশ ঘুরতে হয় দাদা! জার্নালিস্ট মানুষ; এক জায়গায় থাকলে কি চলে?"

—"তারপর হঠাৎ কি মতলবে?"

ভুজঙ্গ অবাক হয়ে গেল—"সে কি! ইলেক্‌শন্ হচ্ছে, খবর রাখেন না?" পরদিন টাউন হলে বিরাট সভা। জগৎনারায়ণ বক্তৃতা করবেন। ভুজঙ্গ একরকম জোর করেই গণেশকে ধরে নিয়ে গেল।

মঞ্চের উপর আগাগোড়া খদ্দর-মোড়া জগৎনারায়ণ বসে আছেন, চারিদিক থেকে ঘিরে আছে ভক্তের দল। শহরের গণ্যমান্য লোক কেউ বাকি নেই, দর্শকদের মধ্যে গণেশ আছে সামনের দিকে। ভুজঙ্গের কাছাকাছি। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "ওহে ভুজঙ্গ, এ যে দেখছি আমাদের সেই পাগলা জগা! ও আবার জগৎনারায়ণ হল কবে?"

অনেকে কট্‌মট্ করে তাকাল। ভুজঙ্গ ঠোঁটের উপর আঙ্গুল রেখে ফিস-ফিস করে বললে—"চুপ!"

গণেশ গজরাতে লাগল—"আরে রাখো তোমার ইয়ে। ওর কীর্তি আমার তো আর অজানা নেই। থার্ড ক্লাসে দু-তুবার ফেল করবার পর হেডমাস্টার তাড়িয়ে দিলেন। তারপর গাঁজার দোকানে পিকেটিং করে গেল জেলে। ওই বুঝি এখন তোমাদের নেতা?"

পাশের থেকে একটি ছোকরা ধমকে উঠল—"চুপ করুন মশাই!"

এক বোঝা ফুলের মালা গলা থেকে নামিয়ে জগৎনারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। হাততালিতে মনে হল সমস্ত হলটা ফেটে পড়বে! ঘণ্টাখানেক, যাকে বলে জ্বালাময়ী বক্তৃতার আগুন ছড়িয়ে, শেষের দিকে বললেন—

"বন্ধুগণ! আমি একজন নগন্য দেশসেবক। শিবেশ বাবুর মত না আছে অর্থ, না আছে খেতাব, না আছে সরকারী সার্টিফিকেটর জোর। শুধু একখানা ছোট্ট সার্টিফিকেট আমার সম্বল। সেটুকু আমি সবসময় সাথে করে নিয়ে বেড়াই। সেইটাই আজ আপনাদের সামনে খুলে দেখাতে চাই। দেখে যদি আপনারা মনে করেন আমার যোগ্যতা আছে দেশসেবার, তা হলে ভোট দেবেন। আর যদি মনে করেন যোগ্যতা নেই, ভোট চাই না —"

এই বলে জগৎনারায়ণ পেছন ফিরে দাঁড়ালেন। একজন ভক্ত তার পিঠের কাপড়টা তুলে ধরল—একটা কাটা দাগ। ভক্ত সংক্ষেপে বললে—"পুলিশের বুট, দেশসেবার পুরস্কার।"

গণেশ আঁতকে উঠল—"অ্যাঁ! বলে কি? পুলিশের বুট! একোবরে রাতকে দিন! ও তো সেই লিচুগাছ থেকে—"

তুমুল হাততালিতে গণেশের কথা ডুবে গেল।

ভুজঙ্গ বাড়ি ফিরে দেখল গণেশ অন্ধকার ঘরে বসে তামাক টানছে।

—"কি দাদা, আলোটাও জ্বালতে পারেন নি?"

গণেশ জবাব দিল না। একমনে অনেকক্ষণ তামাক টেনে আস্তে আস্তে বললে, বুঝলে ভুজঙ্গ, ভেবে দেখলাম জগার রাস্তা ধরলেই ভাল হত। একেই বলে কপাল। টাকা-পয়সা দিয়ে কি হবে? দেখলে একবার মালা আর হাততালির বহরটা?"

ভুজঙ্গ চোখের কোণে তাকিয়ে একটু হেসে বললে, "কেন, লোভ হচ্ছে নাকি আপনার?"

—"আরে, লোভ হলেই হল? ওসব কপালে থাকা চাই। নইলে জগা ব্যাটা স্রেফ ধাপ্পা দিয়ে কী মালা আর হাততালিটাই পেলে!"

গণেশের বুকের ভিতর থেকে একটা মস্ত বড় নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। ভুজঙ্গ একবার চেয়ে দেখল, আড়চোখে। দু-একবার মাথা নাড়ল, কিন্তু কথা বলল না।

দিন চার-পাঁচ পরে, সকালবেলা গণেশ কাজে যাবার আয়োজন করেছে, একখানা খবর-কাগজ হাতে ছুটে এল তার মেয়ে সবিতা।

—"বাবা! বাবা!"

—"কি রে?"

—"এত টাকা দিয়েছ তুমি! কই, আমাদের তো কিছু বল নি?"

—"কোথায়, কিসের টাকা?"

—"এখনও বুঝি লুকোচ্ছ? এই দেখ না, কাগজে বেরিয়েছে।"

গণেশ ব্যস্ত হয়ে বলল, "কি বেরিয়েছে পড় তো।"

সবিতা পড়ে গেল—"আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীগণেশচন্দ্র পাল নিজ শহরে একটি মেয়েদের হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ভগবান তাহাকে দীর্ঘজীবী করুন।"

গণেশ কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সমস্ত হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল একদল ছেলে। একজন হেঁকে বলল, "গণেশ পা—লকি"—আর সবাই গলা ফাটিয়ে চেঁচাল, "জয়!" তারপর সবাই মিলে গণেশকে ঠেলে তুলল কাঁধের উপব গণেশ বেচারী তো ভয়ে অস্থির—"আহা, কর কি! কর কি! পড়ে মরব যে—!"

কে শোনে কার কথা!

ছেলেদের পিছনে এলেন বড়দের দল!

"—সাবাস, সাবাস!"

—"খুব চালটা চেলেছ ভায়া!"

"পেটে পেটে এতও তোমার ছিল!"

—"আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছেন আপনি—শহর আজ ধন্য হল আপনার মতন সন্তানকে বুকে ধরে।"—ইত্যাদি প্রশংসার বান ডেকে গেল। গণেশ কিছু বলবার সুযোগ পেল না, শুধু তাকিয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল করে।

এমনি করে চলল সারাদিন। বিকেলে এলেন এস্ ডি ও। বললেন—"আপনার অনারে, মানে সম্মানে, আমরা একটা সভার আয়োজন করেছি। একটু কষ্ট করে যেতে হবে, এই টাউন হলে।"

গণেশ জানলা দিয়ে দেখল বাইরে লোকে লোকারণ্য।

—"এত লোক কেন?"

—"ও কিছু না, একটুখানি প্রসেশন।"

গণেশ কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, "আমাকে মাপ করবেন স্যার্! মিটিংয়ে গেলে আমার নিশ্চয়ই হার্ট ফেল করবে। ও আমি পারব না"—বলে এক ছুটে বাড়ির ভেতর চলে গেল! ভুজঙ্গের সঙ্গে দেখা। একেবারে ফেটে পড়ল গণেশ—"কোথায় ছিলে এতক্ষণ? এসব কী হচ্ছে?"

ভুজঙ্গ শান্তভাবে জবাব দিল, "মাথা গরম করবেন না দাদা এবার কপাল খুলল আপনার।"

অনেক কষ্টে বুঝিয়ে গণেশকে মিটিংয়ে যেতে রাজী করান হল।

মেয়ে পরিয়ে দিল গরদের জামা-চাদর। ভুজঙ্গ দিলে প্রথম মালা; হেসে বলল, "এই তো কেবল শুরু। আর এই নিন আপনার বক্তৃতা। সবার বলা হয়ে গেলে উঠে দাঁড়িয়ে পড়বেন"—বলে একটা কাগজ ধরিয়ে দিল হাতে।

সে কি মিটিং। টাউন হল ভেঙে পড়ে আর কি! জানলার উপর পর্যন্ত লোক বোঝাই। মঞ্চের ঠিক মাঝখানে শোভা পাচ্ছেন গণেশ পাল। মালায় মালায় ঘাড়ে-গর্দানে একাকার। ঢেকে গেছে নাক পর্যন্ত। গণেশ অতি কষ্টে ঘাড় সোজা করে নাক তুলে বসে আছে। আর একটু হলে দম আটকে যাবে। জগার উপর আর হিংসা নেই। তবুও কেমন একটা ভয়-ভয় ভাব।

শুরু হল বক্তৃতা। কেউ বললেন দানবীর, কেউ বললেন দাতাকর্ণ। প্রবীণ উকিল মহীতোষ বাবু বললেন—"সবচেয়ে বড় দাতা হচ্ছেন তিনি, যাঁর ডান হাত দান করে কিন্তু বাঁ হাত জানতে পায় না।

আমাদের গণেশ আজ সেই আদর্শকে রূপ দিয়েছেন।"

সকলের শেষে গণেশকে জবাব দিতে হল। মালার বোঝা নামিয়ে কোনরকমে পড়ে গেল ভুজঙ্গের সেই কাগজখানা। কান-ফাটানো হাততালির মধ্যে শেষ হল বিরাট সভা। একগাড়ি ফুলের মালা নিয়ে বাড়ি ফিরল গণেশ।

হপ্তাখানেক কেটে গেছে। লোকজন এবার পাতলা হয়ে এসেছে। এমন সময় একদিন দেখা দিলেন হেডমিস্ট্রেস্ সুমিতা দেবী আর তাঁর সঙ্গে ইস্কুল-কমিটির আরও দু-একজন। আর এক দফা গুণগানের পর সুমিতা বললেন, "আমাদের টাকাটা।"

গণেশ আকাশ থেকে পড়ল, "কিসের টাকা ?"

"আজ্ঞে ঐ পঁচিশ হাজার টাকা, যেটা আপনি ইস্কুলের জন্য দান করেছেন ?"

ভুজঙ্গ কাছেই বসেছিল তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে গণেশ বলল, "এঁরা বলেছেন কি, ভুজঙ্গ ? আমি নাকি পঁচিশ হাজার টাকা দান করেছি ? শোন কথা!"

ভুজঙ্গ চেয়ারটা টেনে একটু এগিয়ে এসে বলল, "আপনারা কি বলছেন ঠিক বুঝতে পারছিনা।"

সুমিতার গলা কাঠ হয়ে গিয়েছিল, কথা বেরুল না। ইস্কুল-কমিটির ভবেশবাবু বললেন, "আপনার কথাই বরং আমরা বুঝতে পারছি না। কে না জানে উনি ইস্কুলের জন্যে পঁচিশ হাজার টাকা দান করেছেন ? খবর-কাগজে বেরিয়েছে। ঘটা করে মস্ত সভা ডেকে ওঁকে মানপত্র পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। আর এখন বলছেন—"

ভুজঙ্গ ধীর ভাবে বলল, "সবই ঠিক। কিন্তু সে সম্বন্ধে উনি কি বলেছেন সেটা আপনারা শুনেছেন কি ?"

—"শুনেছি বই কি ? ওর বক্তৃতাও শুনেছি।"

ভুজঙ্গ পকেট থেকে একটা খবরের কাগজ বের করে বলল, "এই দেখুন সেই বক্তৃতার রিপোর্ট। দেখুন ঠিক আছে কিনা ?"

সুমিতা দেবী কাগজটায় একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, "হ্যাঁ—এইটেই তো মনে হচ্ছে।"

—"আচ্ছা, তাহলে শুনুন, আমি পড়ে যাচ্ছি," বলে, ভুজঙ্গ রিপোর্টটা পড়ে গেল।

"বন্ধুগণ, আপনারা আজ আমাকে যে সম্মান দেখালেন, আমি তার একেবারেই যোগ্য নই। এমন কিছুই আমি করি নি, যার জন্যে আপনাদের কোন প্রশংসা দাবি করতে পারি। এ অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নেই এবং ছিল না।

"আপনারা আমাকে কেউ বলেছেন, দান-বীর, কেউ বলেছেন দাতাকর্ণ। শুনে যে লজ্জায় আমার মাথা নুয়ে পড়ে। আপনারা প্রচার করেছেন আমি মস্ত বড় দান করেছি। আমার সাধ্য কি দান করি? সে সৌভাগ্য কোথায়? সে সঙ্গতিই বা কই? আমার মত ক্ষুদ্র লোকের কি দানের স্পর্ধা সাজে? তবু নিতান্তই বিনা কারণে আপনারা আমাকে যে সম্মান দিলেন তার জন্যে শত কোটি ধন্যবাদ।

পড়া থামিয়ে ভুজঙ্গ বললে, "আশা করি এবার বুঝতে পেরেছেন যে আপনারা মেতে উঠলেও দানের কথা উনি স্রেফ অস্বীকার করে গেছেন। তাই নয় কি?"

সুমিতা ও তার সঙ্গীরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন, জবাব খুঁজে পেল না। সত্যিই তো। এ কথাগুলোকে বিনয় মনে করে তাঁরা কত হাততালিই না দিয়েছিলেন! তখন কে জানত এর এ রকম একটা নিদারুণ মানেও হতে পারে!

আলনার উপরে মালাগুলো তখনও একেবারে শুকোয় নি। সেই দিকে চেয়ে গণেশ পাল বলল, "কিন্তু ওরা যদি মামলা করে?"

"মামলা!"—ভুজঙ্গ হো হো করে হেসে উঠল। "এ অপনার বিজনেস্ নয় দাদা, এর নাম জার্নালিজম। আমরা খবরের কাগজের লোক, রীতিমত আটঘাট বেঁধে চলি।"

———

অ-আ-ই-উ

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

বাগবাজার সিটি হাইইস্কুলের 'নাইন-বি' শ্রেণীতে যে সব ছেলে পড়িত, তাহাদের মধ্যে 'অ-আ-ই-উ' সমস্ত শিক্ষকমণ্ডলীর দৃষ্টি যেভাবে এবং যতটা পরিমাণে আকর্ষণ করিয়াছিল, তেমন আর কেহ পারে নাই।

অ অর্থে অবিনাশ
আ ,, আশু
ই ,, ইন্দু
উ ,, উমাপদ

ইহারা চারিজনে এক এবং একেতেই চারি। রাত্রিটা ছাড়া, সারাদিনের মধ্যে, কি স্কুলের ভিতরে, কি স্কুলের বাহিরে, এই চারিটি কিশোরকে সর্বদাই একত্র দেখিতে পাওয়া যাইত। এই চারিজন সহপাঠীর সম্বন্ধে হেড পণ্ডিত মশায়ের স-রস অভিমত এই যে, ইহারা ত্রেতার রাম-লক্ষ্মণ ইত্যাদির কৈলিক সংস্করণ; এবং এই কারণেই স্কুলের মধ্যে ইহাদের সংক্ষিপ্ত যৌগিক নাম—'অ-আ-ই-উ'।

হেড পণ্ডিতমশায়ের ছিল—সিংহ রাশি। ক্লাসের ছেলেরা তাঁহাকে ভয়ও করিত যত, নির্ভয়ে মনে মনে গালাগালিও দিত তত। 'অ-আ-ই-উ' প্রায়ই আড়ালে অন্য ছেলেদের কাছে তাঁহার সম্বন্ধে বলিত, দেখিস্ তোরা, যে-হাতে যেত নিয়ে উনি আস্ফালন করেন, সেই হাতটি শীঘ্রই ওঁর পক্ষাঘাতে ধরবে।

তাহাদের এই ভবিষ্যদ্বাণী যেন ভৃগুসংহিতার গণনার মত আশ্চর্যরূপে মিলিয়া গেল। ঐ কথা বলিবার সপ্তাহখানেকের মধ্যেই পক্ষাঘাতে না হউক, কলতলায় পিছলাইয়া পড়িয়া দিয়া পণ্ডিত মশায়ের দক্ষিণ হস্তটি এরূপ বিষমরূপে জখম হইয়া গেল যে, ডাক্তার ডাকিতে হইল, ওষুধের হাট বসাইতে হইল, শয্যা গ্রহণ করিতে হইল, স্কুল হইতে এক মাসের ছুটি লইতে হইল এবং আরও কত-কি করিতে হইল।

এক মাসেরই মধ্যে যদিচ তাঁহার হস্ত ভাল হইল বটে, কিন্তু বুকে-পিঠে কিসের একটা ব্যথা দেখা দিল এবং সেই ব্যথা তাহার অনেক সাঙ্গোপাঙ্গকে ডাকিয়া আনিল ; যথা—অল্প জ্বর, মাথা ধরা এবং ঘোরা, হাত-পা জ্বালা, অরুচি, গা-বমি, পেট ফাঁপা—ইত্যাদি। সুতরাং স্কুলের এক মাসের সমস্ত ছুটি ফুরাইয়া গেল, ডাক্তারের পরামর্শে তাঁহাকে আরও তিন মাসের ছুটির দরখাস্ত করিতে হইল এবং ছুটি মঞ্জুর হইলে, তাহাকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য মধুপুরে ছুটিতে হইল—যেখানে তাঁহার মামাতো ভাইয়ের শ্যালিকার নন্দাই শ্রীযুত কৃষ্ণদাস ভিষকরত্ন কবিরাজী ব্যবসায় করিয়া থাকেন।

এদিকে পণ্ডিতমশাইয়ের স্থানে স্কুলে তিন মাসের জন্য যে নূতন পণ্ডিতমশায় আসিলেন, তাঁর নাম—নিবারণ চক্রবর্তী। তিনি 'মেষ'-এ খান, শনিবার স্কুল করিয়া 'উইক-এণ্ড'-এ দেশে যান, সোমবার প্রথম ট্রেনে ফিরিয়া আসিয়া স্কুল করেন, হেসে হেসে সকলের সঙ্গে কথা কহেন, সর্বদা শুদ্ধবেশে থাকেন এবং নিত্য প্রাতে পূজান্তে 'শিখায়' একটি করিয়া পূজার ফুল বাঁধিয়া ছাত্রদের পড়ান। এ-হেন নির্মল চরিত্র এবং নিরীহ নিবারণ চক্রবর্তী বার বার বারণ করিয়াও যখন সেদিন 'অ-আ-ই-উ'-কে পড়ার সময় গল্প করা হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন অতিমাত্রায় বিরক্ত হইয়াই এবং 'ই-উ'-কে, অর্থাৎ ইন্দু ও উমাপদকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া রাখিলেন।

যাহা কখনও ঘটে নাই, তাহাই ঘটিল। সূর্যদেব স্থানভ্রষ্ট হইল,

পৃথিবী নিশ্চল হইল, আকাশ নামিয়া আসিল, সমুদ্র শুকাইয়া গেল, বৈশাখে উত্তর বাতাস বহিতে লাগিল। অন্য ছেলেরা বলাবলি করতে লাগিল, এইবার কি হয়—কি হয়। 'অ-আ-ই-উ'কে দাঁড় করিয়ে রাখা! বুকের পাটাখানা ত কম নয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই স্কুলের ছুটির পর 'অ-আ-ই-উ' পরামর্শ করিল, দাঁড় করিয়ে রাখার মজাটা কালকেই দেখিয়ে দিতে হবে ভাল করে। তাহার পর পরস্পর প্রকাশ্যভাবে যে পরামর্শটা করিয়া রাখিল, আর সকলের কাছে তাহা অপ্রকাশ্যই রহিল।

পরদিন নিবারণ পণ্ডিত ক্লাসে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার চেয়ারের সামনে টেবিলের উপর একখানি কাগজে লাল কালিতে বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

নিবারণ চক্কোত্তি........
মেসে করেন উদরপূর্তি।
টিকিতে বাঁধেন ফুল,
নিজেও একটি Fool!
শনিবার যান দেশে;
মরবেন অবশেষে।
মলে পরে টানতে টানতে
নিয়ে যাব নিমতলাতে।

সেইদিন 'অ-আ-ই-উ' পাশাপাশি না বসাইয়া সমস্ত বর্ণমালার মধ্যে ছড়াইয়া বসিয়াছিল। নিবারণ পণ্ডিত লেখাটি মনে মনে পাঠ করিয়াই ভীষণ গরম হইয়া কহিলেন, এটা কে লিখেছে?

কোথা হইতে উত্তর আসিল, আমি পণ্ডিত মশাই।

চারিদিকে রক্তবর্ণ চক্ষুর বক্রদৃষ্টি প্রেরণ করিয়া নিবারণ পণ্ডিত কহিলেন, কে?

একটি ছেলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, ইন্দু!

'ই'-র দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া পণ্ডিত কহিলেন, তুমি লিখেছ?

'ই' কহিল, কবিতা লেখা শিখছি একটু একটু।

—দাঁড়িয়ে উত্তর দাও।

'ই' দাঁড়াইল। পণ্ডিতমহাশয় কহিলেন, ঐভাবে সমস্ত ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকবে। আজ থাকবে, কাল থাকবে, পরশু থাকবে।

—১৩৪৮ সালটাই থাকবো। বলিয়া 'ই' বসিয়া পড়িল।

নিবারণ পণ্ডিত তখন দমকা হাওয়ার মত 'ই'-র সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং গর্জন্ করিয়া কহিলেন, শুধু দাঁড়ানো নয়; বেঞ্চির উপর দাঁড়াও। দাঁড়াও—দাঁড়াও—দাঁড়াও। বলিয়া তুই হাতে তাহার তুই কাঁধ ধরিয়া ভীষণভাবে একটা ঝাঁকানি দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে টানিয়া, ঠেলিয়া, ধাক্কা দিয়া, অবশেষে বেঞ্চির উপর দাঁড় করিতে বাধ্য করিলেন! যৎপরোনাস্তি নির্যাতিত হইয়া 'ই' বেঞ্চের উপর দাঁড়াইল। তখন তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিল, যেন সর্বদেহ তাহার কাঁপিতে লাগিল। 'আ' একস্থান হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, স্যার, অমন করে ওকে দাঁড় করিয়ে দিলেন; ওর যে ফিটের ব্যায়রাম আছে, ঐ দেখুন কাঁপছে।

রোষকষায়িত নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া পণ্ডিত কহিলেন, কাঁপুক।

সঙ্গে সঙ্গেই একটা কোলাহল উঠিল। 'ই' দাঁড়াইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বেঞ্চের উপর হইতে ধড়াস্ করিয়া একেবারে নীচে পড়িয়া গিয়াছে 'অ-আ-উ' ছুটিয়া 'ই'-কে ঘিরিয়া বসিল। 'অ' কহিল, যা ভয় কচ্ছিলুম—তাই। একেবারে সেন্সলেস! হায় হায়, কেন স্যার, ওকে দাঁড় করাতে গেলেন! 'আ' মুখের মধ্যে আঙ্গুল দিয়া কহিল, ঈস্—একেবারে দাঁতকপাটি। 'উ' নাকের কাছে হাত রাখিয়া বিষম চিন্তিতভাবে কহিল, নিশ্বাস পড়ছে ত?

নিবারণ পণ্ডিত ছুটিয়া আসিলেন। তিনিও কাঁপিতে লাগিলেন; তবে বাইরে নয়, ভিতরে; অর্থাৎ দেহে নয়, মনে। ভয়-চকিত নেত্রে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, শিগ্ গির এক ঘটি জল নিয়ে

এস, আর একখানা পাখা।

'আ' কহিল, আর পাখা! এ যে গা ক্রমেই ঠাণ্ডা আর কাঠ হয়ে আসছে। স্যার, নাড়ীটা একবার দেখুন দেখি, যেন নেই বলে মনে হচ্ছে। নিবারণ পণ্ডিত কম্পিত হাতে নাড়ীটা দেখিলেন। তাঁহার মনে হইল, সত্যই যেন নাড়ী ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। তাঁহার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল, মাথা ঘুরিয়া গেল, তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। 'উ' কহিল, আর কি হবে! স্কুলের ভেতর পণ্ডিতমশায়ের হাতেই ওর প্রাণটা এইভাবে যাবে, এইটেই হয়ত ওর কপালে লেখা ছিল!

'অ' কহিল, সকলে মিলে হট্টগোল করো না। অন্য সব মাষ্টারমশাইরা যেন একথা টের না পান।

সুবিধার মধ্যে, সেকেণ্ড ক্লাসের ঘরখানা রাস্তার দিকেই ছিল এবং রাস্তার দিকেই তার একটা দরজা ছিল। 'অ-আ-উ'র সঙ্গে তখন নিবারণ পণ্ডিতের এইরূপ পরামর্শ হইল যে, একখানা ট্যাক্সিতে করিয়া 'ই'-কে তাহার গৃহে লইয়া যাওয়া হউক এবং একটি ডাক্তারকে ডাকা হউক। যাহাতে স্কুল কর্তৃপক্ষের কানে কথাটা না যায়, সেজন্য পণ্ডিতমহাশয় অনেক ধরিয়া সকলকে—বিশেষ 'অ-আ-উ-কে অনুরোধ করিলেন এবং 'আ'-র হাতে একখানি দশ টাকার নোট দিয়া কহিলেন, এই থেকে খরচ-পত্র করো। নোটখানা ট্যাঁকে গুঁজিয়া 'আ' কহিল, খুচরো একটা টাকা থাকে ত দিন, ট্যাক্সি ভাড়াটা দিয়ে দেবো।

সন্ধ্যার পূর্বে পার্কে বসিয়া চারি বন্ধুতে কথা হইতেছিল। তাহাদের পরামর্শের সুফল দর্শনে সকলেই সবিশেষ স্ফূর্তিযুক্ত। নোটখানা অবিনাশ পকেট হইতে বাহির করিয়া তাহার ভাঁজ খুলিয়া সকলের সম্মুখে ধরিয়া কহিল, কাল বুধবার, সকলে দক্ষিণেশ্বরে গমনং এবং সেখানে এই টাকাতে ভাল করে ফীস্ট করণং। তোমরা রাজী ত?

সকলেই সোৎসাহে রাজী হইল। রাজী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশু প্রস্তাব করিল, এস, আজ সকলে এই পার্কে কাটানো যাক। প্রস্তাব গৃহীত হইয়া গেল।

এই চারিটি ছেলে মধ্যে মধ্যে এইরূপ করিত এবং এইজন্য গৃহে তাহাদের যথেষ্ট তিরস্কার ও লাঞ্ছনাও ভোগ করিতে হইত। কিন্তু কিছুতেই তাহাদের এইসব স্বভাবের পরিবর্তন ঘটে নাই। তাহারা বলিত—

"চল্‌চি মোরা সুমুখ পানে—
মোরা নবীন দীপ্ত,
এগিয়ে চলার নেশার টানে
চিত্ত মোদের ক্ষিপ্ত।"

কিন্তু ইহার ভিতর আর একটি লক্ষ্য করিবার জিনিস আছে। লেখাপড়ার দিক দিয়াও 'চিত্ত ইহাদের ক্ষিপ্ত'। পরীক্ষায় প্রথম চারিটি স্থান ইহাদেরই একচেটিয়া অধিকার। এ বিষয়ে ক্লাসের কেহই কখনও ইহাদের পরাভব করিতে পারে নাই।

ইন্দু কহিল, আজ রাতে পার্কে কাটানো নেহাৎ মন্দ হবে না। লাইফের এ হ'ল একটা ছোট-খাট য়্যাডভেঞ্চার। আমরা যেন সাবেক কালের সেই রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, পাত্রের পুত্র আর কোটালের পুত্র। চার বন্ধুতে যেন বিদেশে এসেছি। কিন্তু ভাই, তা হলে এক কাজ করতে হবে। খানিক খানিক সময় তিনজন করে ঘুমুবে আর একজন পাহারায় থাকবে।

ব্যবস্থামতই কার্য হইল। সারারাত্রি পালা করিয়া, পাহারা দিয়া এবং ঘুমাইয়া পার্কের মধ্যেই তাহাদের কাটিয়া গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছিল। প্রত্যূষে সকলে জাগরিত হইলে দেখা গেল যে, অবিনাশের পকেটের সেই দশ টাকার নোটখানি নেই; তাহা যেন ভানুমতীর বাজীর মত কোথাও অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ব্যাপারটি একদিকে উপেক্ষারও নয় এবং অপরদিকে ইহা

লইয়া হৈ-চৈ করাও চলে না। যে হউক একজন নিশ্চয়ই নোটখানি লইয়াছে। হয়ত সকলের জামা-কাপড় অনুসন্ধান করিলে, কাহারও না কাহারও কাছ হইতে বাহির হইয়া পড়িবে। কিন্তু কেহই যখন স্বীকার করিতেছে না, তখন সেইরূপ কার্য করিতে যাওয়ার মানে—পরস্পরের বন্ধুত্বের প্রতি একটা অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাসের ভাব জাগাইয়া তোলা। চারিজনের মধ্যে যে নোটখানি লইয়াছে, নিশ্চয়ই বন্ধুত্বের অপেক্ষা লোভই তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। আবার এমনও হওয়া আশ্চর্যের নহে যে, সেই লোভের অন্তরালে এমন একটা প্রয়োজন বা অভাব তাহার বর্তমান যে, আর কোনও দিক সে বিচার করবার অবকাশ পায় নাই। যাহা হউক, এই ব্যাপারে সকলেরই মুখে একটা বিস্ময় এবং ক্ষুণ্ণভাব দেখা দিল।

পাড়ায় নেড়ামামা বলিয়া এক সরকারী মামা ছিলেন। তিনি ইহাদের চারিজনকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন ও ভালবাসিতেন। ইহারাও তাঁহাকে একদিকে আপন মাতুলের ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত, অপরদিকে বয়স্যের ন্যায় তাঁহার সহিত নির্দোষ আমোদ-আহ্লাদ করিতেও ছাড়িত না।

অবিনাশ কহিল, চল সকলে, নেড়ামামার ওখানে যাওয়া যাক। ওখান থেকে চা খেয়ে, যে যার বাড়ী যাবে। তবে আজ আর স্কুলে যাওয়া নয়।

নেড়ামামার গৃহে আসিলে, তিনি কহিলেন,—সকালবেলাতেই সব কি মনে করে রে? চা খাবি নাকি সব এক কাপ করে?

ইন্দু কহিল, সেইজন্যেই ত সকলের মামার বাড়ী শুভাগমন, মামা।

অতঃপর কোন ফাঁকে একটু আড়ালে গিয়া অবিনাশ নেড়ামামাকে তাহাদের পার্কে যাত্রিযাপন এবং নোট চুরির কথা জানাইল। সমস্ত শুনিয়া নেড়ামামা কহিলেন, আমি কাজীর বিচারে এই দণ্ডেই নোট চোরকে ধরে ফেলবো। তবে তোদের মধ্যে কাকেও জানতে দেব না।

তাতে বন্ধুত্বের প্রণয়ে একটা দাগ এসে পড়বে। তবে, আমি জানতে পারবো এবং তার কাছ থেকে নোটখানাও বার করে দেব।

তারপর সকলের চা খাওয়া হইলে নেড়ামামা কহিলেন, আজ তোদের একটা গল্প বলব, সকলে মন দিয়ে শোন্।

নেড়ামামা গল্প শুরু করিলেন—

বহুকাল আগে দক্ষিণ দেশে বিক্রমবাহু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর একটি মাত্র ছেলে—নাম বলাদিত্য বলাদিত্যের বয়স যখন বারো বৎসর তখন এক সন্ন্যাসী ঠাকুর একদিন রাজবাটিতে এসে রাজার অনুরোধে তার বিষয়ে গণনা করতে বসলেন। গণনা করে তিনি বললেন, রাজপুত্রের একটা ফাঁড়া আছে। সেই ফাঁড়ার সময় অতি নিকটে। এই সময় একটি কাজ করলে ঐ ফাঁড়া থেকে উদ্ধার পাওয়া যেতে পারবে। রাজা বললেন, কি কাজ? সন্ন্যাসী বললেন, আসছে অষ্টমীর দিন বেলা তিন প্রহরের সময় মহাবনের মধ্যে যে বনদেবীর মন্দির আছে, রাজপুত্রকে উত্তম বসন-ভূষণে সজ্জিত হয়ে একলা সেই স্থানে গিয়ে দেবীর পায়ে প্রণাম করে আসতে হবে। তা হলেই ফাঁড়া কেটে যাবে। যথাদিনে উত্তম বসন-ভূষণে সজ্জিত হয়ে রাজপুত্র একলা মহাবনে প্রবেশ করলেন। খানিক যেতেই এক কাপালিকের সঙ্গে দেখা। কাপালিক কহিল, তোমার মতই একটি সুন্দর বালক আমি চাই, পূজোয় বলিদান দেব, চলো।

রাজপুত্র বললেন, সে তো আমার পরম সৌভাগ্য। আমি বনদেবীকে প্রণাম করতে যাচ্ছি; আপনি এইখানে অপেক্ষা করুন, আমি শীঘ্রই ফিরে আসব। কাপালিক রাজপুত্রের কথায় ভুলে সেইখানে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

আর কিছু দূরে গেলে এক বিষধর সর্প রাজপুত্রের সামনে এসে ফণা তুলে বললে, অনেকদিন মানুষকে ছোবল দেবার সুযোগ পাইনি। আজ তোমাকে ছোবল দেবো।

রাজপুত্র তাকে বললেন, তাতে আর কি ; ছোবলই দেবেন। আমি বনদেবীকে প্রণাম করতে যাচ্ছি. আপনিই এইখানে অপেক্ষা করুন। আমি ফিরে এলেই ছোবল দেবেন !

আরও খানিক অগ্রসর হ'লে সহসা এক ভীষণ দর্শন সিংহ রাজপুত্রের সামনে এসে বলল, মানুষের মাংস বহুকাল পেটে যায় নি, আজ তোমাকে পেটে পুরবো। রাজপুত্র বললেন, আমি বনদেবীকে প্রণাম করতে যাচ্ছি, এখনই ফিরে আসব ; তখন আপনি আমায় পেটে পুরবেন। তার জন্য আর কথা কি ? সিংহ সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে রাজপুত্রের ফিরে আসার অপেক্ষা করতে লাগলো।

আরও কিছু পথ অগ্রসর হলে, এক দস্যু এসে রাজপুত্রের হাত ধরলো। সে বললে, আজ আমার ভারি লাভের দিন, নইলে এত সব দামী সোনা, হীরে, মুক্তার গহনা শুদ্ধ তোমাকে পাই ? এখন এস, সব অলঙ্কার তোমার গা থেকে খুলে নি।

রাজপুত্র বললেন, আমি বনদেবীকে প্রণাম করতে যাচ্ছি। ফিরে এলে সব অলঙ্কার নিয়ে নেবেন। এইখানে অপেক্ষা করে একটু থাকুন, আমি শিগ্‌গির ফিরে আসব।

দস্যু সেইখানে রাজপুত্রের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলো। কিন্তু তোমরা বুঝতেই পারছ যে, সে-পথে রাজপুত্র আর ফিরে এলেন না। সকলকে স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে রেখে রাজপুত্র অন্য পথে বাড়ী ফিরে গেলেন।

ছেলেরা তখন প্রশ্ন করিল, তারপর কি হল মামা ?

নেড়ামামা কহিলেন, তারপর যা হ'ল তা তোমাদের একে একে আমি বলব। তোমরা চারজনেই ওদিককার বারান্দার ঐ বেঞ্চিতে গিয়ে বসো ; আমি এক একজনকে ডেকে বাকী গল্পটা শোনাব।

সকলেই বারান্দার সেই বেঞ্চে গিয়া বসিল। নেড়ামামা প্রথমে অবিনাশকে ডাকিয়া কহিলেন, আচ্ছা, গল্পটা ত শুনলি। এখন বল্ দেখি, কাপালিক, সাপ, সিংহ আর দস্যু—এদের মধ্যে কে বেশী বোকা?

অবিনাশ কহিল, কাপালিকই বোকা, মামা। রাজপুত্রকে যে ছেড়ে দিলে, তা বনের ভেতর আর বলিদানের ছেলে সে পাবে কোথায় ? সেই সবচেয়ে বোকা।

মামা কহিলেন, তুই ঐ ওদিককার ঘরের ভেতর গিয়ে বোস্। অবিনাশ চলিয়া গেল।

তারপর মামা আশুকে ডাকিয়া ঐ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। আশুও কহিল যে, কাপালিকটাই বিষম বোকা। সে নির্দয় কাপালিক হয়ে রাজপুত্রের স্তোকবাক্যে ভুলে গেল।

মামা তাহাকেও ঐ ঘরে গিয়ে বসিতে বলিলেন। তারপর ডাকিলেন ইন্দুকে। ইন্দু মামার প্রশ্নের উত্তরে কহিল, সিংহটাই বোকা। পশুরাজ হয়ে যে এমন বোকারাজ হয়, এত ভারী আশ্চর্য। শিকার হাতে পেয়ে কখন কেউ ত্যাগ করে ?

মামার আদেশে, ইন্দু সে ঘরে গিয়া বসিল। তারপর উমাপদকে ডাকিয়া মামা জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, সবচেয়ে বোকা হচ্ছে মামা ঐ চোরটা। অত সব দামী দামী গয়না, এমন সুযোগ হেলায় হারায় যে, তার মত বোকা ত দুনিয়ায় আর কেউ নেই।

মামা কহিলেন, উমাপদ আমি কারও কাছেই প্রকাশ করবো না। কিন্তু নোটখানা তুই-ই নিয়েছিস্। কাজীর বিচারে আমি ধরে ফেলেছি। তা তোর কোন লজ্জা বা ভয় করবার দরকার নেই। এ কথা তুই আর আমি ছাড়া এদের ভেতর কেউ জানতে পারবে না। খুবই হয়ত দরকারে পড়ে তুই এ কাজ করেছিস্, তা আমি বুঝেছি। কিন্তু এ নোটখানা তোকে ফিরিয়ে দিতেই হবে। কোথায় রেখেছিস্, বার করে দে।

উমাপদ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি মামা কি করে জানলেন যে, আমি নিয়েছি ?

—ঐ যে বললুম, কাজীর বিচার। চোরকে তুই যখন সবচেয়ে বোকা বলেছিস্, তখন বুঝেছি যে, তোরও লোভ ঐ গয়নাগুলোর

ওপর। নোটখানার লোভও কিছুতেই সংবরণ করতে পারিস্ নি।

এই কথা বলিয়া মামা উমাপদকে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক প্রকার বুঝাইলে, উমাপদ নোটখানি বাহির করিয়া মামার হাতে দিল। সে নোটখানা জুতার শুকতলার নীচে লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

তাহার পর মামা চারিজনকে এক সঙ্গে ডাকিয়া নানা প্রকার বাজে গল্প-গাছা করিবার পর, নোটখানি অবিনাশের হাতে দিয়া কহিলেন, দেখ দেখি রে, এই নোটখানাই কি নয়?

অবিনাশ কহিল, এক কোণে 'অ-আ-ই-উ' লেখা আছে, হ্যাঁ মামা —এইখানাই।

সকলেই তখন এই ব্যাপারে অতিমাত্রায় চকিত হইল। মামা কিন্তু কাহাকেও জানিতে দিলেন না যে কে নোট চুরি করিয়াছিল। শুধু বলিলেন যে, নোটখানা পণ্ডিতমশায়কে ফিরাইয়া দিতে হইবে। তিনি নোট সংক্রান্ত সকল কথাই অবিশ্বাশের মুখে শুনিয়াছিলেন।

সেদিন কেহই আর স্কুলে গেল না। কিন্তু নিবারণ পণ্ডিত সকালেই তুইবার অবিনাশের বাটীতে আসিলেন, ইন্দু কেমন আছে দেখিতে। সমস্ত রাত তুর্ভাবনায় তাঁহার ভাল করিয়া নিদ্রা হয় নাই। প্রথমবার তাঁহার সহিত অবিনাশের দেখা হয় নাই; সে তখন নেড়ামামার বাড়ীতে। দ্বিতীয়বার যখন আসিলেন, তখন শুধু অবিনাশের সঙ্গে নয়, সকলেরই সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। নোটখানা তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল এবং 'অ-আ-ই-উ' তাঁহাকে পরামর্শ দান করল, স্যার, আমাদের ওপর একটু 'স্পেশ্যাল ফেবার' করবেন। পড়া-শুনোতে আমরা ঠিকই আছি এবং ঠিকই থাকব স্যার।

বাস্তবিকই পড়াশুনাতে তাহারা বরাবর ঠিকই ছিল। অবিনাশ, আশু এবং ইন্দু-এই বৎসর এম-এ এবং নোট চোর উমাপদ এম-এস-সি পাশ করিয়াছে।

———

বুদ্ধি কেনা

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নদীর ধারে গাঁ। গাঁয়ে শুধু তাঁতীদের বাস। সারাদিন তারা তাঁত চালায়—মেয়েরা সুতো কাটে। সেই কাপড় বেচে যৎসামান্য যা পায় তাতে অতিকষ্টে তাদের দিন চলে। আমোদ নেই, প্রমোদ নেই—সকলে শুধু খাটছে আর খাটছে। দুঃখ-কষ্ট কোনদিন ঘোচে না। ক'পুরুষ ধরেই তাদের এমনি অবস্থা।

তারা দুঃখ করে—বলে,—পাশাপাশি আর সব গ্রামে কত লোক থাকে—তারা কাজকর্ম করে, খায়—পরে, তারা পাল-পার্বণ করে, যাত্রা-গান করে, কত আমোদ-আহ্লাদ করে। তাদের কত লোক কোঠা-বাড়ী তৈরী করেছে—আমাদের কিন্তু খোড়ো চালায় বাস করেই দিন কাটছে চিরকাল—সেই বাপ-পিতোমোর আমল থেকে। কেন—কেন আমাদের দুঃখ-কষ্ট কোনদিন ঘোচে না?

একজন বললে,—তার কারণ, লোকে আমাদের বোকা বলে। আমাদের জ্ঞান নেই, বুদ্ধি নেই। তা নেই বলেই দুঃখ-কষ্ট ঘোচাবার মতলব আমরা ঠাওরাতে পারি না। আর সব গাঁয়ে দু'চারজন করে পণ্ডিত আর বুদ্ধিমান আছে তো—তারা মতলব দেয়। সেই মতলব মতো চলে অন্য গাঁয়ের লোকেরা বেশ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে।

আরেকজন বলে উঠলো,—এ জ্ঞান-বুদ্ধি যেখান থেকে ওরা পায়, আমরা কি সেখান থেকে পেতে পারি না?

আরেকজন বললে,—শুনেছি, নবদ্বীপে জ্ঞান আর বুদ্ধি কিনতে পাওয়া যায়।

—আমরা কি নবদ্বীপ থেকে জ্ঞান-বুদ্ধি কিনে আনতে পারি না ?

—তা'. কেন পারবো না ? তবে শুনেছি জ্ঞান আর বুদ্ধির অনেক দাম।

—জ্ঞান থাক, শুধু বুদ্ধি যদি আমরা কিনি ! বুদ্ধির জোরেই তো মানুষ অনেক রকম মতলব ঠিক করতে পারে আমরা শুধু বুদ্ধিই কিনবো—তার জন্য কত দাম লাগবে ?

যে-লোক নবদ্বীপের নাম করেছিল, সে বললে,—অন্ততঃ একসের বুদ্ধি কেনা চাই—গাঁয়ের সকলে একটু একটু ভাগ করে নেবো। কিন্তু তার দাম জুটবে কি করে ?

একজন বললে,—চাঁদা....চাঁদা....চাঁদা ! সকলে মিলে চাঁদা দেবে —সেই চাঁদার টাকায় আমরা বুদ্ধি কিনে আনবো, এনে সকলে একটু একটু ভাগ করে নেবো। তা' হলেই সেই বুদ্ধির জোরে আমাদের দুঃখ ঘোচাতে পারবো।

তখুনি সভা বসলো। সকলেই এ প্রস্তাব শুনলো, শুনে সকলেই বললে—দেবো চাঁদা।

সভায় চাঁদা সংগ্রহ হলো পঁচিশটি টাকা। তখন প্রশ্ন উঠলো কে যাবে নবদ্বীপে এই টাকা নিয়ে বুদ্ধি কিনতে।

গাঁ থেকে নবদ্বীপে যেতে নৌকায় তিন দিন সময় লাগে—নৌকা ছাড়া যাবার অন্য উপায় নেই। পাঁচিশটি টাকা নিয়ে তিনজন মাতব্বর তাঁতী গাঁয়ের নৌকা নিয়ে নবদ্বীপ চললো।

তি-দিনের দিন নবদ্বীপের ঘাটে পৌঁছে নৌকা থেকে নেমে পথের এক দোকানে ঢুকে তিনজন পেটভরে চিঁড়ে-মুড়কি খেলো। খেয়ে তিনজনে চললো বাজারের দিকে বুদ্ধি কিনতে।

বাজারে গিয়ে এ দোকানে ঢোকে, সে দোকানে ঢোকে, ও দোকানে—ঢুকে বলে,—দোকানে বুদ্ধি পাবো গা ? আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি বুদ্ধি কিনতে।

দোকানীরা শুনে কেউ হাসে, কেউ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, কেউ বলে,—না বাপু, বুদ্ধি এ দোকানে বিক্রী হয় না।

বেচারীরা বেলা দু'টো পর্য্যন্ত কত দোকানে ঘুরলো, কোথাও বুদ্ধি পেলো না। এক গাছতলায় বসে তারা ভাবছে, তাই তো, কোন দোকানে বুদ্ধি পাচ্ছি না—এখন উপায় ?

এক ধূর্ত্ত লোক তাদের উপর নজর রেখে ঘুরছিলো। সে বললে,—তোমরা বুদ্ধি কিনতে এসেছ—বুদ্ধি পাচ্ছো না, আমি দিতে পারি বুদ্ধি। আমি বুদ্ধির ব্যবসা করি। তোমাদের কতখানি বুদ্ধি চাই ?

তারা বললে,—আজ্ঞে এক সের।

ধূর্ত্ত বললে,—কত দাম দিতে পারো ?

তারা বললে,—আজ্ঞে, চাঁদা করে পঁচিশটি টাকা যোগাড় করে এনেছি—সেই পঁচিশ টাকা দিতে পারি।

ভুরু কুচকে ধূর্ত্ত বললে,—পঁচিশ টাকায় কি করে হবে ? এক সের বুদ্ধির দাম একশো টাকা।

তাঁতীরা বললে,—আজ্ঞে, একশো টাকা কোথায় পাবো ? আমাদের এ পঁচিশটি টাকা সম্বল।

ধূর্ত্ত বললে,—পঁচিশ টাকায় এক পো' বুদ্ধি মিলতে পারে। তাতে চলবে ?

তারা তিনজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে, করে ধূর্ত্তকে বললে,—আজ্ঞে, এসেছি যখন শুধু-হাতে ফিরতে পারবো না। বুদ্ধি আমাদের চাই-ই। আপনি ঐ এক পো' বুদ্ধি দিন—আমরা তার দাম পঁচিশটি টাকা দেবো।

ধূর্ত্ত বললে,—দা ও, টা কা দাও।

ধূর্ত্তর হাতে তাঁতীরা পঁচিশটি টাকা দিলো। টাকা ট্যাঁকে গুঁজে ধূর্ত্ত বলে,—কাছেই আমার বাড়ী, এসো আমার সঙ্গে। তোমরা সদরে বসবে, আমি ভাঁড়ার থেকে ওজন করে বুদ্ধি এনে তোমাদের হাতে দেবো।

ধূর্ত্তর সঙ্গে তাঁতীরা এলো তার বাড়ী। তিনজনকে সদরে বসিয়ে ধূর্ত্ত ঢুকলো বাড়ীর মধ্যে। ঢুকে, ভাঁড়ার থেকে একটা নেংটি ইঁদুর ধরে বড় একটা শামুকের খোলে নেংটিটাকে পুরলো—পুরে শামুকের খোলটাকে কলাপাতা দিয়ে শক্ত করে মুড়লো মুড়ে খানিকটা লাল শালু নিয়ে নেংটিশুদ্ধ্ শামুকের খোলটা আষ্টেপৃষ্ঠে মুড়ে লম্বা লাল সুতো দিয়ে সেটাকে বেশ করে বাঁধলো—বেঁধে সেটা নিয়ে বাইরে এসে তাঁতীদের হাতে দিলো, দিয়ে বললে,—এর মধ্যে শামুকের খোলে এক পো' বুদ্ধি ওজন করে দিয়েছি। সাবধানে নিয়ে যাও। পথে খবরদার মোড়ক খুলবে না। খুললেই বুদ্ধি ফুড়ুৎ করে পালিয়ে যাবে। গাঁয়ে গিয়ে তারপর মোড়ক খুলে বুদ্ধি নিও।

তাঁতীরা মহাখুশী। ধূর্ত্তকে প্রণাম করে মোড়ক নিয়ে ঘাটে এসে তারা নৌকোয় চাপলো। নৌকা চললো।

তিনদিনের পথে গাঁ। যেতে তারা একদিন এ দেশের ঘাটে নামে, পরের দিন ও দেশের ঘাটে নামে—নেমে দোকান থেকে মুড়ি, মুড়কি, চিঁড়ে কিনে খায়,—খেয়ে আবার নৌকো চালায়।

তিনদিনের দিন নিজেদের গাঁয়ে নৌকা এলো—আর ঘণ্টা দুই পরে গাঁয়ের ঘাট—তখন এদের মনে হলো, আমরা এতো কষ্ট করে বুদ্ধি নিয়ে এলুম, সে বুদ্ধি সকলের সঙ্গে একটু একটু করে সমান ভাগে নেব কেন? এই এক পো' বুদ্ধির আধ পো' আমরা তিনজনে আর বাকী আধ পো' গাঁয়ের বাকী লোক নেবে ভাগ করে।

সকলের সেই মত তখন····নৌকা চলেছে ঘটের দিকে····তারা লাল সূতোর বাঁধন খুলে, লাল শালু খুলে শামুকের খোলটি যেমন বার করা, নেংটি ইঁদুর অমনি ফাঁক পেয়ে ফুড়ুৎ করে লাফিয়ে পড়ে নৌকার খোলে কোথায় সেঁধুলো। এরা তিনজনে চমকে উঠলো? হায়, হায়, নবদ্বীপের লোকটি বারণ করে দিয়েছিল গাঁয়ে নৌকা লাগবার আগে মোড়ক খুলো না—খুললে বুদ্ধি ফুড়ুৎ করে ছিট্‌কে পালিয়ে যাবে। তাই তো হলো! এখন?

তারা পাতি পাতি করে নৌকোর খোলে খুঁজতে লাগলো, কিন্তু নেংটিকে কোথাও পেল না।

এদিকে ঘাটে এসে নৌকো লাগলো। গাঁয়ের যতো লোক ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে। নৌকা ঘাটে লাগতেই তারা এসে বললে,—বুদ্ধি পেয়েছ?

তারা বললে,—বুদ্ধি তো পেয়েছি, কিন্তু বরাবর নিয়ে আসছি আর এই ঘাটের কাছে আসতেই বুদ্ধি ফুড়ুৎ করে এই শামুকের খোল থেকে বেরিয়ে নৌকার খোলে কোথায় যে সেঁধিয়েছে, বুদ্ধিকে আর খুঁজে পাচ্চি না।

সকলে মিলে খুঁজলো, কিন্তু নেংটির কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। তখন সকলে নিশ্বাস ফেলে বললে,—যাক ভাবনা কি? বুদ্ধি যখন নৌকাতেই রইলো, আমরা পালা করে চব্বিশ ঘণ্টা দু'জন নৌকার পাহারাদারী করবো, বুদ্ধি নৌকা ছেড়ে পালাতে পারবে না—নৌকাতেই তাকে থাকতে হবে। তারপর আমাদের কোন কিছু মতলবের দরকার হলে এইখানে এসে বুদ্ধির কাছে প্রার্থনা জানাবো।

সকলে খুশী হয়ে বাড়ী ফিরলো।

———

গুপীর সঙ্গে

লীলা মজুমদার

ব্যাপারটা ঘটেছিল আমাদের হাফ ইয়ার্লির ফল বেরুবার ঠিক পরেই। পরীক্ষার আগে তু'তিন ধরে না খেয়ে না ঘুমিয়ে এতো পড়লাম অথচ ফল বেরুলে দেখলাম ইংরাজিতে ২২, বাংলায় ২৯ আর অঙ্কের কথা নাই বললাম। তাই দেখে শুধু বাড়ীর লোকদের কেন, আমার নিজের সুদ্ধ চক্ষুস্থির। শেষ পর্যন্ত বাড়িতে এক রকম টেকা দায় হল।

আমার বন্ধু গুপীর ও সেই একই অবস্থা। ওর বাবা আরেক কাঠি বাড়া। ক্লাবের নাম কাটিয়ে-টাটিয়ে, মাউথ অ্যার্গান কেড়ে নিয়ে একাকার করলেন। সন্ধ্যেবেলা গুপী এসে বলল, "জানিস, মানোয়ারী জেটি থেকে একটা মাল বোঝাই জাহাজ আন্দামান যাচ্ছে আজ!" আমার হাত থেকে পেন্‌সিলটা পড়ে গেল, বুকের ভিতরটা ধ্বক করে জ্বলে উঠল। বললাম, "কে বলেছে?" গুপী বলল, "আমাদের আপিস থেকে মাল বোঝাই-এর পারমিট করিয়েছে। আজ রাত তুটোয় জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে পড়বে।"

বললাম, "ডায়মণ্ডহারবারের কাছেই ওপার দেখা যায় না। আরেকটু এগুলে না জানি কেমন।" গুপী বলল, "যাবি? না কি বাকি জীবনটা রোজ বিকেলে অঙ্ক কসে কাটাবি?" পেনসিলটা তুলে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলাম। বললাম, "পয়সা-কড়ি নেই, তারা নেবে কেন?" গুপী বলল, পয়সা কেন দেব? অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এক সময় চড়ে বসে থাকব, মেলা জেলে-ডিঙি রয়েছে৷

তার কোন অসুবিধা হবে না। তারপর লাইফবোটের ক্যাম্বিশের ঢাকনির তলায় লুকিয়ে থাকতে হয়। তারপর জাহাজ একবার সমুদ্রে গিয়ে পউলেই হল, ওরও ফেরবার নিয়ম নেই। আমাদেরো নামবার উপায় থাকবেনা। যাবি তো বল। আজ রাত বারোটায় এসপ্ল্যানেডে তোর জন্য অপেক্ষা করব।"

চোখের সামনে যেন দেখতে পেলাম আন্দামানের ঝিনুক দিয়ে বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখি উড়ে যাচ্ছে। আর মাথার উপর ঘোর নীল আকাশ ঝাঁ ঝাঁ করছে, কালো হাতী বিরাট বিরাট সুন্দরী গাছের গুঁড়ি মাথা দিয়ে ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসছে। বসলাম' "বেশ তাই হবে।"

তারপর যে কত বুদ্ধি করে রাত বারোটায় সেখানে গিয়ে গুপীর সঙ্গে জুটলাম সে আর কি বলব। সঙ্গে একটা সার্ট প্যাণ্ট তোয়ালে আর টর্চ ছাড়া আর কিছু নেই। রাতে খাবার সময় ঐ পুরানো কথা নিয়ে আবার একচোট হয়ে গেছে। বাড়িতে থাকবার আর আমার একটুও ইচ্ছা নেই। আর গুপীর কথা তো ছেড়েই দিলাম। সে কোনদিনই বাড়িতে থাকতে চায় না।

গঙ্গার দিকেই যাচ্ছিলাম। অনেকটা এগিয়েছি, লাটসাহেবের বাড়ির গেটটা পেরিয়ে আরো খানিকটা গিয়েছি, এমন সময় দেখি ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডের পাশে, ইডেন গার্ডেনের সামনে দিয়ে একটা প্রকাণ্ড চার ঘোড়ার গাড়ি আসছে। আমরা তো অবাক। জন্মে কখন চার ঘোড়ার গাড়ি দেখিনি। কলকাতা সহরে আর চার ঘোড়ার গাড়ি যে আছে তাই জানতাম না। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে গেলাম।

দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম চারটে কালো কুচকুচে দৈত্যের মত বিরাট ঘোড়া। তাদের সাজগুলো তারার আলোয় জ্বলজ্বল করছে। ঘাড়গুলো ধনুকের মত বাঁকা, মাঝে মাঝে মাথা ঝাড়া দিচ্ছে, নাক দিয়ে ফড়র-ফড়র আওয়াজ করছে, ঝন্‌ঝন্ করে চেন বকলস্ বেজে

উঠছে। অত দূর থেকেও সে শব্দ আমাদের কানে আসছে। ষোলটা ক্ষুর থেকে মাঝে মাঝে স্পার্ক দিচ্ছে। সে না দেখলে ভাবা যায় না।

গাড়িটা ততক্ষণে ইডেন গার্ডেনের পাশ দিয়ে বাঁ-হাতে ঘুরে এসেম্বলি হাউসের দিকে বেঁকেছে। ঐখানে সারাদিন মিস্ত্রীরা কাজ করছে পথে দু' একটা ইটপাটকেল পড়ে থাকবে হয়তো। তাতেই হোঁচট খেয়ে সামনে দিককার একটা ঘোড়ার পা থেকে নালটা খুলে গিয়ে শাঁই শাঁই করে অন্ধকারের মধ্যে ভাঙা চক্র এঁকে কতকগুলি ঝোপ-ঝাপের মধ্যে গিয়ে পড়ল। খানিকটা ক্ষুরের খটাখট চেনের ঝম্‌ঝম্ শব্দ করে, আরো হাত বারো গড়িয়ে এসে বিশাল গাড়িটা থেমে গেল।

ততক্ষণে আমরা দু'জনে একেবারে কাছের গোড়ায় এসে পড়েছি। দেখি গাড়ির পিছন থেকে চারজন সবুজ পোষাক পরা কোমরে সোনালী বেল্ট আঁটা সইস্ নেমে পড়ে, ছুটে গিয়ে চারটে ঘোড়ার মুখে লাগাম কষে ধরেছে। সামনে দিকের ডান হাতের ঘোড়াটার চোখের সাদা দেখা যাচ্ছে। আকাশের দিকে মাথা তুলে সে একবার ভীষন জোরে চিঁহিহিহি করে ডেকে উঠল। সেই শব্দ চারিদিকে গমগম করতে লাগল।

মনে হয় ওরা কোন থিয়েটার পার্টির লোক, কোনো বিদেশী জাহাজে অভিনয় করে ফিরছিল। কারণ লোকটার দেখলাম রাজার মত পোষাক পরা, কিংখাবের জোব্বা পাজামা, গলায় মুক্তোর মালা কানে হীরে। আর সে কি ফর্সা সুন্দর দেখতে। মাথায় মনে হল সাত ফুট লম্বা। রাজা সাজবারই মত চেহারা বটে! ততক্ষণে সবাই মিলে অন্ধকারের মধ্যেই নালটাকে খুঁজছে। আমাদের দিকে কারো লক্ষ্য নেই। আমি টপ্ করে থলি থেকে টর্চটা বের করে টিপতেই দেখি ঐ ঝোপের গোড়ায় নালটা পড়ে আছে। রূপোর মত ঝকঝক করছে। গুপী ছুটে গিয়ে সেটি হাতে করে তুলে নিল, তখনো একেবারে গরম হয়ে আছে।

নীল হাতে ওদের কাছে গেলাম। এতক্ষণে আমাদের দিকে ওদের চোখ পড়ল। "কোথায় পেলি বাপ?" ঐখানে ঝোপের গোড়ায়" গুপী ঝোপটা দেখিয়ে দিল। "বাঃ বেড়ে আলোখানি তো বাপ। ওরাই দিয়েছে বোধ হয়। তা হলে আরেকটু দয়া করে এদিকে কোথায় কামারের দোকান আছে বলে দে দিকিন। ওটি না লাগালে তো আর যাওয়া যাবে না।"

আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গুপীর দিকে তাকালাম। কামার আবার কোথায় পাব? গুপী বললে, "চলুন, আগে একটা সাইকেল মেরামতের দোকান আছে, তাদের আমি চিনি, তারা করে দিতে পারবে মনে হচ্ছে।"

"তা হলে ওঠ বাপ ওঠ। আর সময় নেই।"

তু'জনে গাড়ির মধ্যে ভদ্রলোকের পাশে উঠে বসলাম। মখমলের সব গদী। থিয়েটারের লোকেরা আছে বেশ। আর ভুর ভুর করছে আতরের তামাকের গন্ধ। ভদ্রলোকের সঙ্গে মেলা দলিলপত্রও রয়েছে দেখলাম।

গুপী বাৎলিয়ে দিল বাঁয়ে ঘুরে ডালহৌসি স্কোয়ারের দিকে পথ, আস্তে আস্তে চললাম। ঘোড়ার পায়ে ব্যথা লাগে। ছোট গলির মধ্যে দোকান। অত বড় চার ঘোড়ার গাড়ি তার মধ্যে ঢুকবে না।

ঢুকলেও আর ঘুরবার উপায় থাকবে না। ভদ্রলোক কেবলই তাড়া দিতে লাগলেন, দেরী করলে নাকি একটা মানুষের প্রাণ যাবে? তখন গুপী নাল হাতে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে বলল "এইখানে দাঁড়ান, আমি গিয়ে যন্ত্রপাতি শুদ্ধ, শম্ভুকে ডেকে আনি। তুই আয় আমার সঙ্গে।" অগত্যা তু'জনেই নামলাম। শম্ভুকে ঠেঙিয়ে তুলতে একটু দেরী হল। তারপর প্রথমটা কিছুতেই বিশ্বাস করে না। চার ঘোড়ার গাড়ি আবার কি? এ তল্লাটে কোথায়ও চার ঘোড়ার গাড়ি হয় না। একটা চার ঠ্যাংওয়ালা ঘোড়াই দেখতে

পাওয়া যায় না। তা আবার চারটে ঘোড়া এক গাড়িতে। শেষটা ঘোড়ার নালটা দেখে একেবারে থ। "এই এত বড় নাল হয় ঘোড়ার? হাতী নয় তো? হাতীর পায়ে আমি নাল লাগাতে পারব না গুপী দাদা, এই বলে দিলাম।"

আমরা বুঝিয়ে বললাম "চল না, গিয়ে নিজের চোখেই দেখবে। এত প্রকাণ্ড ঘোড়াই দেখলে কোথায়, যে এত বড় নাল দেখবে? চল তোমার লোহাটোয় নিয়ে চল ওদের খুব তাড়াতাড়ি আছে। দেরী করলে কার যেন প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে। মেলা কাগজপত্র নিয়ে চলেছেন। চল। নাও, ধর, নালটাও তোমার যন্ত্রের বাক্সে রাখ! ভারী আছে।"

শম্ভু জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল। "বড় ঘোড়া যে হয় না তা বলছি না। ফতেপুর শিক্রি গিয়ে আকবরের ঘোড়ার যে বিরাট নাল দেখে এসেছি, তারপর আর কি বলি।

কথা বলতে বলতে গলির মুখে এসে পড়েছি। কিন্তু কোথায় চার ঘোড়ার গাড়ি? চারিদিক চুপচাপ থমথম করছে, পথে ভালো আলো নেই, একটা মানুষ নেই, কুকুর নেই, বেড়াল নেই, কিছু নেই। ডাইনে বাঁয়ে দু'দিকে যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে দেখলাম, কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না।

রাস্তার আলোর কাছে গিয়ে কি মনে করে, শম্ভু যন্ত্রপাতির বাক্সটা খুলে নালটা বের করতে গিয়ে দেখে বাক্সের মধ্যে নালও নেই। তখন শম্ভু ফ্যাকাশে মুখে আমাদের দিকে চেয়ে বলল, "ও গাড়ি আরো অনেকে দেখেছে, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকে না।" বলে আমাদের একরকম টানতে টানতে ওর বাড়ী নিয়ে গেল। পরদিন সকালে যে যার বাড়ী ফিরে গেলাম। গুপী আর জাহাজের কথা তুলল না!

চন্দর

প্রবোধকুমার সান্ন্যাল

ঠাকুর মশাইয়ের সংসারে আপনার লোক বলতে আর কেউ নেই। সে-বার গ্রামে কি একটা মহামারী দেখা দিল, দেখতে দেখতে তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা একে একে ইহলীলা সংবরণ করলে। দুর্ভাগ্য আসে দরিদ্রের সংসারে, সুতরাং দুঃখ করবার কিছু নেই। আত্মীয়-পরিজন সবাই ত গেলই—উপরন্তু দেনার দায়ে ঠাকুরমশাইকে বাস্তুভিটাটি পর্যন্ত মহাজনের হাতে ছেড়ে দিতে হোল। এবার তিনি পথে বসলেন।

রইল কেবল একজন, সে বাড়ীর পুরানো চাকর। নাম চন্দর। বহুকাল থেকে এই পরিবারে সে মানুষ। লোকটা অত্যন্ত বিনয়ী এবং নিরীহ। তাকে দেখলে মনে হ'তে পারে, জীবনে কোনোদিন সে রাগ করেনি। তার ঠিক বয়সটা অনুমান করা কঠিন, কেউ বলে তিরিশ, কেউ বলে পঞ্চাশ। কিন্তু বয়স তার যাই হোক, সে যথেষ্ট পরিশ্রমী এবং শান্ত। সাত চড়ে রা নেই।

ঠাকুরমশাই বললেন—তোরই মরবার কথা চন্দর, কিন্তু তুই রইলি বেঁচে। আমি এখন তোকে খাওয়াই পরাই কি উপায়ে বলত?

সবিনয়ে হেসে হাতদুখানা কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে চন্দর বললে—এজ্ঞে, আমি আপনার পায়ের জুতো, কর্তা। আমাকে মারবেন মারুন, কাটবেন কাটুন, আমি আপনাকে ছেড়ে যেতে পারবো না?

ঠাকুরমশাই বললেন—এখন তবে কি নিয়ে থাকবি? আমি ত আর আগেকার মতো মাইনে পত্তর দিতে পারবো না?

চন্দর বললে—আপনার কত খেয়েছি, কত নিয়েছি, মাইনে যদি আর নাই দেন, তা হ'লেই কি আর চলে যেতে পারবো ?

একেবারে প্রভুভক্ত জীব। ঠাকুরমশাইয়ের ব্যবহারের জন্য জল তুলে আনে, পূজোর ফুল তুলে দেয়, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ব'সে প্রভুর পদসেবা করে।

একদিন ঠাকুরমশাই বললেন—হ্যাঁরে চন্দন, আগে তোর যে অভ্যেসটা ছিল আজকাল সেটা সেরে গেছে ত ?

চন্দর বললে—এজ্ঞে, সে কি কথা চুরি ত আর আমি করিনে ? আপনার ঘরে চুরি করলে আমার যে সাত জন্ম নরকবাস হবে, ঠাকুর !

ঠাকুরমশাই হেসে বললেন—তোর চুরি বরং সহ্য হবে চন্দর, কিন্তু তুই ধর্মের কথা বলিসনে, বাবা।

চন্দর হাত কচলে বললে—হেঁ হেঁ !

গ্রামে বারোয়ারী তলায় একটি শিবের মন্দির ছিল, ঠাকুরমশাই তার পূজারি! পুরানো মন্দিরটির পাশের ঘরটিতে তিনি থাকেন, ঘরের আসবাব তাঁর যৎসামান্য—ঘরের বাইরের জায়গাটুকুতে থাকে চন্দর। ঠাকুরমশাইয়ের মতো সংসারে কেউ নেই। ঠাকুরমশাই রাঁধেন, আর সে তাঁর প্রসাদ পায়।

গ্রামের সেই মহামারীতে অনেক লোকে গ্রাম ছেড়ে নানা দেশে পালিয়েছে, মন্দিরে আর বিশেষ কেউ পূজো দিতে আসে না। নিজেরাই খেতে পায় না, শিবঠাকুরকে আর খাওয়াবে কেমন ক'রে ? মন্দিরের অবস্থা দিনে দিনে অত্যন্ত খারাপ হ'য়ে উঠলো। ঠাকুর-মশাইয়ের দিন চলা ভার। নগদ পয়সা-কড়ি ত দূরের কথা, খাবার জিনিসপত্রও আসা বন্ধ হোল।

ঠাকুরমশাই একদিন অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। বললেন—তুই অপয়া হতভাগা তোর জন্যেই আমার এত দুঃখ, তুই দূর হয়ে যা। আমিও চলে যাচ্ছি যে দিকে দু'চোখ যায়।

চন্দর বললে—কোথা যাবো, কর্তা ?

—সে আমি কি জানি। আমার সবাই যে চুলোয় গেছে, তুইও যা সেইখানে।

চন্দর বললে—আফিংয়ের পয়সা দিন কর্তা, আমি বিষ খেয়ে মরবো!

ঠাকুরমশাই রাগে একখানা চ্যালা কাঠ নিয়ে তাকে তাড়া করলেন। বললেন—বেরো হতভাগা!

অতঃপর তিনি এই দুঃখের দেশ ত্যাগ ক'রে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। আর তিনি কোনোদিন এ গ্রামে ফিরবেন না। ঘরের জিনিস-পত্র অতি সামান্য, সঙ্গে কিছুই নেবার নেই। ঘটি-বাটি সব দেনার দায়ে আগেই বিক্রি হ'য়ে গেছে। ছোট একটি বাক্সে সামান্য ক'খানা কাপড়-চাদর ছিল। বাক্সের তালা-চাবি খুলে তিনি দেখলেন, এক-খানা পুঁথি পড়ে আছে কিন্তু কাপড়-চাদরের চিহ্নমাত্র নেই, কি হোল ? আবার তিনি বাইরে এসে চন্দরকে ডাকলেন। চন্দর কোথাও যায়নি, ডাক শুনে কাছে এসে দাঁড়ালো। তিনি বললেন—হতভাগা, তালা-চাবি বন্ধ, ভেতর থেকে কাপড় চোপড় গেল কোথায় ?

চন্দর বললে—তলায় হয়ত ফুটো ছিল, কর্তা।

তাইত, এ কথাটা কিন্তু ঠাকুরমশাইয়ের আগে মনে হয়নি, তিনি আবার ঘরে ঢুকে বাক্স পরীক্ষা ক'কে দেখলেন, সত্যিই বটে, ছোট্ট একটা ছিদ্র রয়েছে! ওই ছিদ্র দিয়েই সব বেরিয়ে গেছে।

যাক্ গে, তিনি আবার প্রস্তুত হতে লাগলেন। একটা মাটির হাঁড়িতে অনেকদিন আগেকার গোটাকতক পয়সা জমা ছিল,—শিবের নামের পয়সা,—হাঁড়িটা নাড়াচাড়া ক'রে গেল, পয়সাগুলি নেই। আবার তিনি চীৎকার ক'রে চন্দরকে ডাকলেন। বললেন—হারামজাদা, চোর, আমি হলপ ক'রে বলতে পারি, তোর কাজ!

চন্দর জিভ কেটে চোখ কপালে তুলে বললে—এজ্ঞে সে কি কথা, কোথায় রেখেছিলেন পয়সা, কর্তা ?

ঠাকুর রাগে হাঁড়িটা তার দিকে গড়িয়ে দিলেন। চন্দর বললে—এই হাঁড়িতে? তবে ত হারাবেই কর্তা! এত ইঁদুর-বেড়ালের উৎপাত, পয়সা থাকবে কেমন ক'রে?

তা বটে, এ কথাটা কিন্তু ঠাকুরমশাইয়ের আগে মনে হয়নি। তাঁর রাগ পড়ে গেল, নিরস্ত হ'য়ে আবার তিনি বিদেশ-যাত্রার জন্য আয়োজন করতে লাগলেন।

গ্রামের পরে মাঠ; মাঠের পথ দিয়ে কিছুদূর গেলে নদী। সেই নদী পার হ'য়ে ঠাকুরমশাইয়ের পৈতৃক যজমানদের গ্রাম পড়ে। তিনি স্থির করলেন, যজমানদের কাছে তিনি কিছু কিছু অর্থসাহায্য নিয়ে তীর্থযাত্রা করবেন। জ্যোতিষ-বিদ্যা তাঁর অল্প অল্প জানা ছিল, তাই দিয়ে তিনি দিন যাপন করবেন। সংসারে একজন মানুষের আর ভাবনা কি?

একটি ঝুলি কাঁধে নিয়ে একাকী সেদিন দুপুর রোদে তিনি পথে বেরিয়ে পড়লেন। মাঠের পথ ধরে কিছুদূর গিয়ে পিছন ফিরে দেখেন, চন্দর।

—আবার যে তুই ভূতের মতন পিছু নিয়েছিস।

হাত কচলে চন্দর বললে—এজ্ঞে!

—আমাকে তুই ছাড়বিনে হতভাগা?

এজ্ঞে, আপনিই কি আমাকে ছাড়তে পারেন? আমি আপনার পায়ের জুতো যে।

আর কোনো উপায় নেই, অগত্যা ঠাকুরমশাই চন্দরকে সঙ্গে নিতে বাধ্য হলেন।

নদী পার হ'য়ে যজমানদের গ্রাম। কিন্তু তারাও দরিদ্র। ঠাকুর মশাই একে একে কয়েকদিন তাদের বাড়ী অতিথি হলেন কিন্তু নগদ বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না। লোকে এক মুঠো খেতে দিতে পারে কিন্তু পয়সা-কড়ি তাদের কাছে পাওয়া কঠিন। ঠাকুরমশাইয়ের ঝুলিতে কয়েকটি পয়সা জমা হোল। একদিন ঝুলিতে সে পয়সা-

গুলিও খুঁজে পাওয়া গেল না। ঠাকুরমশাই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। চন্দর তাঁকে পাখার বাতাস ক'রে বললে—কি হোল কর্তা ?

ঠাকুরমশাই জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তা। দিকে চেয়ে বললেন—কোথায় গেল পয়সা ক'টা ?

চন্দর চুপি চুপি তাঁর কানের কাছে মুখ এনে বললে—আমি জানি কর্তা বলতে সাহস হয় না কিন্তু আমি জানি কে নিয়েছে !

ঠাকুরমশাই দাঁতের ওপর দাঁত চেপে বললেন—শীগ্‌গির বল, নৈলে তোকে এখুনি ব্রহ্মশাপ দেবো।

হাত জোড় করে চন্দর বললে—রাগ করবেন না কর্তা, এরা সবাই গরীব-দুঃখী···আহা! কে নিয়েছেন জানেন, ওই আপনার যজমান, ওই লম্বা লোকটা—

—সে কি! ওই তো দিয়েছিল পয়সা!

—সেই কথাই ত বলছি কর্তা, এমনই দিনকাল পড়েছে। গরীব লোক কিনা, দিনের বেলা প্রণামী দিয়ে রাতের বেলা হাত সাফাই ক'রে নেয়।

তা বটে, এই সামান্য কথাটা ঠাকুরমশায়ের এতক্ষণ মনে হয়নি। সত্যিই ত দিনকাল খারাপ—বেচারা যজমানের জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। আর কিন্তু এইখানে থাকা ভালো দেখায় না। বললেন—কিছু মনে করিসনে বাবা চন্দর, তোকে অনেক কটু কথা বলেছি। চল্ আজই আমরা এখান থেকে চ'লে যাই।

পরদিন প্রভাতে উঠে চাকর এবং মনিব আবার দেশত্যাগ ক'রে গেলেন। বন পার হ'তে হোল, পার হতে হোল প্রান্তর, ছোট ছোট নদী ও খাল তারপর গ্রাম, গ্রাম পার হ'য়ে দু'জনকে আসতে হোল ইস্‌লামপুর রেল স্টেশনে।

গাড়ী-ভাড়া নেই, সুতরাং স্টেশনের ধারে ঝুলি এলিয়ে ঠাকুরমশাই জ্যোতির্ব্বিদ্যার পুঁথি খুলে পথে ব'সে গেলেন। একটু দূরে চন্দর হাত জোড় ক'রে ব'সে গেল ভক্ত হনুমানের মতো।

হ্যাঁ, কিছু রোজগার হোল বটে। ঠাকুরমশাই অনেক পথিকের হাত দেখে দেখে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা ক'রে দিলেন। অনেকে খুশী হ'য়ে পয়সা দিয়ে গেল। চন্দর হাত জোড় ক'রে চক্ষু বুজে ভক্তি গদগদচিত্তে বসে রইল, পয়সার শব্দ হলেই কেবল সে একবার মিট্ মিট্ ক'রে তাকাচ্ছিল!

দিন তিনেক কাটলো সেই স্টেশনের ধারে। কিছু পয়সা জমিয়ে ঠাকুরমশাই তাঁর অনুগত ভৃত্যটিকে নিয়ে সেদিন সকাল বেলায় শহরগামী ট্রেনে চড়ে বসলেন—বললেন—নিজের কপাল যেমনই হোক, পরের কপাল নিয়ে মাথা ঘামালে কপাল কিছু ফিরে যায়।

চন্দর হাত কচলে বললে—তাইত, এজ্ঞে।

ঠাকুরমশাই চলন্ত ট্রেনের ভিতরে ব'সে খুশী মনে অনেক কথা ব'লে গেলেন। তারপর কিঞ্চিৎ জলযোগ করবার পূর্বে পয়সার থলিটা বা'র ক'রে বললেন—চন্দর তুই আমার বিশ্বাসী বাবা, এই নে, রাখ্, পয়সা-কড়ি এবার থেকে তোরই কাছে থাকবে। ওসব আমি সামলাতে পারিনে।—পয়সার থলিটা তিনি চন্দরের হাতে গুঁজে দিলেন।

আজ চন্দর স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। সে অনুগত ভৃত্য, সে সেবক, কিন্তু বিশ্বাসী সে নয়। জীবনে কোনোদিন পয়সার থলি হাতে দিয়ে কেউ তাকে বিশ্বাস করেনি! ঠাকুরমশাইয়ের ঘরে যত চুরি আজ পর্যন্ত হয়েছে, সবই তার কাজ। সে মিথ্যাবাদী, সে চোর, সে অবিশ্বাসী,—নিজের অসৎ স্বভাবের জন্য কোনোদিন সে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। কিন্তু জীবনে আজ এই প্রথম অনুতাপে তার চোখে জল এসে দাঁড়ালো। এই বিশ্বাসের ভার সে বইবে কেমন করে?

কিন্তু তার মুখে আর একটি কথাও ফুটলো না। কেবল নিঃশব্দে ঠাকুরমশাইয়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে সে নীরবে জানলার বাইরে প্রশান্ত প্রান্তরের দিকে চেয়ে রইলো।

বিচিত্র অতিথি

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

'প্রিয় সম্পাদক মহাশয়—' এইটুকু মাত্র লিখেছি, এমন সময়ে কালো হাফপ্যান্ট-পরা, গায়ে নতুন গেঞ্জি, খালি পা, কালো, হাত দুই লম্বা একটি ছেলে বাড়ির ফটকে এসে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললে, "নমস্কার।"

প্রায় ঐ রকম দেখতে, ঐ রকম বয়সের, ঐ রকমের পোষাক পরা অনেকগুলি মানব-শিশু সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের পরও চারধারে একক বা সদলে ঘুরে বেড়ায়, চীৎকার করে শিস্ দেয়, গাছে চড়ে, ঢিল ছোড়ে, ছোটে, খেলে। কেবল ঐতেই তাদের জীবন-শক্তি ক্ষয় হয় না, তারা খেলাসম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করে, মারামারি করে, অশোভন ভাষায় পরস্পরকে গালাগালি দেয় আর আমার কুকুরটির চীৎকারের আর ডাকের অনুকরণ করতে করতে ছুটে পালায়। তাই যেমন আমি তাদের পছন্দ করি না, তেমনি সেও। আমি তাদের দেখলেই ভ্রূকুটি করে তাদের দিকে তাকাই। তারা অবশ্য তা গ্রাহ্য করে না। কারই বা করে—পিতা-মাতা কারোই তোয়াক্কা রাখে না তো আমার মতো লোকের। আমার কুকুরটিকে কিন্তু তারা সমীহ করে। কারণ সে তাদের বা তাদের মতো কারোকে দেখলেই চীৎকার করে, কখন কখন বাড়ির সীমানা পর্যন্ত তেড়ে গিয়ে মনের ক্ষোভ জানায়।

ফটকে আগত ছেলেটিকে দেখে আমার প্রথমে মনে হলো, সে

তাদের কেউ, হয়তো বাগানে বা ছাদে বল পড়েছে, নিতে এসে থাকবে। ঐ যে 'নমৎকার' শব্দটি ব্যবহার করে বিনয় ও শিষ্টতা প্রকাশ করেছে তা আমার প্রতি নয়, আমার কুকুরটির প্রতি। কিন্তু কুকুর আদর-ভালোবাসা বুঝলেও বিনয় ও শিষ্টতার ধার যে ধারে না তা তখনই তেড়ে গিয়ে বুঝিয়ে দিলে।

ছেলেটি কিন্তু ফটক থেকে নড়লো না, বন্ধ ফটকের বাইরে তেমনি শান্তভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

রুক্ষস্বরে জিগ্যেস করলাম, "কী চাই?"

সে হাত জোড় করে মাথায় ঠেকিয়ে বললে, "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সুখ-দুঃখ" এবং তারপর আমাকে কোন কথা বলবার অবসর না দিয়েই আবৃত্তি করতে লাগলো,

"বসেছে আজ রথের তলায়
স্নানযাত্রার মেলা—"

সমস্ত কবিতাটি আবৃত্তি করে আবার একটি কবিতার সুর আবৃত্তি করলো—

"পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও—"

আবৃত্তি শেষ করে হাত পেতে মিনতি জানালো, বললে, "দুটো কুচো পয়সা।"

এতখানি বয়স পর্যন্ত গাঁয়ে, শহরে, ট্রামে, ট্রেনে ভিখারীকে ঠাকুর-দেবতা সম্বন্ধে গান ও ছড়া গেয়ে ভিক্ষা করতে দেখেছি, কেউ কেউ নিজ অন্ধত্বের বেদনা প্রকাশ করে ভিক্ষা চেয়েছে, কিন্তু সেও গানে। আর এ ছোকরা দেখছি, রবিঠাকুরের কবিতা আউড়ে ভিক্ষা চাইছে! কে বলে রবিঠাকুরের কবিতা সাধারণ লোকের কাছে পৌছয় নি? আজ কবিতা শুনছি, কাল বেহালা, হার-মনিয়াম বা খোল-করতাল অথবা গুপীযন্ত্র বাজিয়ে হয়তো কোন ভিখারীকে ভিক্ষা করতে দেখবো! সেদিন রবীন্দ্র-সঙ্গীতবিশেষজ্ঞদের

পসার যে কমবে এতে আর ভুল কী? কমুক গে। সে তাঁরা বুঝবেন।

কৌতূহল হলো। ছেলেটাকে বললাম, "ভেতরে এস।"

সে বললে, "কুকুর আছে। আপনি এখানেই দিন। আমি সারাদিন কিছু খাই নি।"

"আমি কী দেবো, দেবোই কি না তা কী করে জানলে? ভেতরে এসো, কথা আছে। কুকুর কিছু বলবে না, আমি ডেকে নিচ্ছি।"

বললাম না যে, কুকুরটা ভীরু, কামড়ায় না, কেবল ডাকে। ভীরুকে লোকে সাহসী মনে করে তফাতে থাকলে গৃহকর্তার লোকসান নেই। তাই সত্য প্রকাশ করলাম না।

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে ফটক খুলতেই কুকুরটা তেড়ে গেল।

ধমক দিলাম, "জলি! নাঃ।"

নির্লজ্জ, অবাধ্য কুকুরটা তবু নিষেধ না শুনে ছেলেটির গায়ের গন্ধ শুঁকে তার মুখের দিকে তাকিয়ে সরে এসে আমার চেয়ারের পাশে শুয়ে পড়লো।

ছেলেটিকে বললাম, "তুমি যে সারাদিন অভুক্ত তা কী করে বুঝবো?"

"আমার কথা বিশ্বাস না করলে আর কী বলবো?"

"মুড়ি খাবে?

"পয়সা দিন, খাবার কিনে খাবো।"

"যা দেবো তাতে একগালও মুড়ি হবে না। বেশ, মুড়ি না খাও চা-পাঁউরুটি দিচ্ছি। খাবে?"

সে একটু ইতস্ততঃ করে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। নাতনীকে ডেকে চা-পাঁউরুটি আনতে বললাম।

নাতনী ড্যাব ড্যাব করে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে আমার কাছে সরে এসে কানে কানে বলল, "দাদু, ছেলেটা চোর।"

তাকে সরিয়ে দিয়ে বললাম, "তোমায় যা বলছি করো।"

সে বললে "এই তো সবে উনুনে আগুন দিয়েছে। ধরুক, তবে তো চা হবে।"

"উনুনে বাতাস করতে বলো গে।"

"রান্নাঘরের পাখাখানা ভেঙে গেছে—"

"অন্য পাখা দিয়ে বাতাস করুক।"

"দিমা বকবে।"

"বলে দেখো গে।"

"কে বকুনি খাবে? বাবাঃ! আমি পারবো না। তুমি বলে এসো।"

"চা না হয় পরে এনে দিও। এখন একখানা কোয়ার্টার পাউনড্ পাঁউরুটি এনে দাও।"

"থাকলে আনছি, না থাকলে কী হবে জানো? আছে তাই খাচ্ছো না, না-থাকলে খেতে—"

সে বেণী দুলিয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল।

এবার ছেলেটিকে নিয়ে পড়লাম; বললাম, "যে কবিতাটি শেষে আওড়ালে ওটি কার রচনা জান?"

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের—"

"তবে তো জানোই। ওটি কামিনী রায়ের—"

ছেলেটি সন্দিগ্ধ চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়েই হেসে বললে, "কামিনীবাবুর নয়, রবিঠাকুরের।"

"যা বলেছি ঠিক। কামিনী রায় স্ত্রীলোক, পুরুষ নন। লিখতে পড়তে জানো?"

"না।"

"কার কাছে শিখেছো কবিতা দুটো?"

"আমার এক দাদার কাছে।

"তিনি কী করেন? কোথায় তোমাদের বাড়ী?

"দাদা কী করে জানি নে। আমার কেউ কোথাও নেই।

"কী রকম ! দাদা আছে বলছো আবার বলছো কেউ কোথাও নেই—"

ছেলেটি উস্‌খুস করতে লাগলো।

বললাম, "পালাবার চেষ্টা করো না। দেখছো তো কুকুরটা উঠে গিয়ে দরজা আগলে শুয়ে হাঁ করে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। পালাতে গেলেই ঠ্যাং কামড়ে ধরবে। ও বুঝতে পেরেছে তোমার মতলব। আজ সারাদিনে কত পয়সা ভিক্ষে করেছো ?"

"একটাও না।"

"দেখি তোমার পকেট।" বলে আমি সেদিকে হাত বাড়াতেই সে সরে দাঁড়ালো। বুঝতে পারলাম, সে মিছে কথা বলেছে, তার প্যাণ্টের পকেটে কিছু পয়সা আছে।

বললাম, "রোজ যা ভিক্ষে করে পাও তাতে তোমার চলে ? খেয়ে পেট ভরে কোথায় ?"

সে এ সব প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললে, "যা দিতে হয় দিন, না দিলে আমি চললাম। আমি যেন চোর এমনি ব্যবহার আমার সঙ্গে করছেন। আপনি পুলিশ নাকি ?"

চমকে উঠলাম। ভিখারী বালকের এত তেজ ! ইতিমধ্যে একটি ছোট এনামেলের গেলাসে এক গেলাস চা ও ছোট পাঁউরুটি নিয়ে আমার নাতনী ঘরে ঢুকে আমার টেবিলে রেখে একটু তফাতে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো।

ছেলেটিকে বললাম, "এই যে খাও।"

সে এগিয়ে এসে চা ও পাঁউরুটিখানি নিয়ে খেতে আরম্ভ করলো। খাওয়া হয়ে গেলে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছে যাবার উদ্যোগ করতেই বললাম, "যেও না। আচ্ছা, আমার বাড়িতে থাকবে ? তোমায় বিশেষ কিছু করতে হবে না, আমার ছোট নাতনীটিকে পেরামবুলেটারে চড়িয়ে রোজ দু বেলা ঐ পার্কে বেড়িয়ে আনতে হবে। তোমায় থাকতে-খেতে আর মাইনে দেব কিছু। থাকবে ?"

সে বললে, "না।"

"কেন ?"

"আ.মি স্বাধীন হয়ে থাকবো।"

"কিন্তু তোমার স্বাধীনতা রক্ষা করছো তো ভিক্ষা করে। ভিক্ষা করা কী সম্মানের ?"

"কারো সম্মান চাই না। যেতে দিন আমায়—"

"তোমায় তো আটকে রাখি নি।"

"কুকুরটাকে ডেকে নিন—"

কুকুরটাকে ডাকতে হলো না, সে ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু দরজা ছাড়লো না।

ছেলেটি হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। তার কালো গাল দুখানা বেয়ে জল ঝরতে লাগলো।

বললাম, "কাঁদছো কেন ? আমি কি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি ?"

সে কাঁদতে কাঁদতে ঘাড় নেড়ে জানালো, "না।"

বললাম "তবে ?

সে বললে, "আমার দেরী হলে মারবে।"

অবাক হলাম—বললাম, "কে ?" কিন্তু সে আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলো। আবার প্রশ্ন করলাম, "কে মারবে ? এই যে তুমি বললে, স্বাধীন থাকবে। যখন দেরি হলে একজন তোমায় মারবে তখন তুমি নিশ্চয়ই তার অধীন। কী! কথা কইছো না কেন ?"

নাতনী আস্তে আস্তে সরে এসে আমার চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়ালো।

বললাম, "আমার মনে হয় তোমাকে দিয়ে কেউ ভিক্ষে করায়! তুমি যে দাদার কথা বললে, সেই তোমাদের দলের সর্দার। কিছু লেখাপড়া শিখেছে। জানে, এ বছর রবীন্দ্র-শতাব্দ। তাই রবি-

ঠাকুরের লেখা কবিতা তোমাকে দিয়ে মুখস্থ করিয়ে ভিক্ষে করাচ্ছে। কী? তাই নয়? তাকে পুলিশে দেওয়া উচিত।"

পুলিশের নাম শুনে ছেলেটার মুখে-চোখে তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠলো; আবার বললে, "আমায় যেতে দিন। জোর করে ধরে রাখলে আপনাকেই পুলিশের হাঙ্গামায় পড়তে হবে।"

মাত্র হাত দুই লম্বা, একটা নিরক্ষর ভিখারী বালকের এত বুদ্ধি! এমন তুড়ুক জবাব! এতখানি জ্ঞান! নাঃ! আর ওকে আটকে রাখা ঠিক নয়। যেচে পরোপকার করতে গিয়ে কী শেষে ফ্যাসাদে পড়বো? ছোকরা দেখছি সব পারে। এখনই হয়তো 'মেরে ফেললে' বলে চীৎকার জুড়বে, কুকুরটাও অমনি ডাকতে আরম্ভ করবে। আর চারধার থেকে লোকে ছুটে আসবে। পাড়ায় আমরা শত্রুর অভাব নেই। কিন্তু ঐ একরত্তি ছোকরার কাছে হার মানবো? কিছুতেই না। আমার পৌরুষ জেগে উঠলো। বললাম, "ছোট মুখে বড় কথা বলছিস যে!"

"কী বড় কথা বলেছি? আপনি ভদ্দরলোক, আমি গরিব বেচারী। দুটো কুচো পয়সা চাইতে এসে আমাকে কত কথা শুনতে হলো। আবার বলছেন, আপনার বাড়িতে কাজ করতে। তা হলে আর আস্ত রাখবেন না।"

ইচ্ছা করতে লাগলো ছোঁড়াটার গালে ঠাস্ ঠাস্ করে দুটো চড় কষে দি। কিন্তু যে দিনকাল পড়েছে তাতে মারা যেমন সহজ তেমনি কঠিন, হোক না সে ভিখারী বালক। তাই তার ঘাড় ধরে তাকে ফটকের বাইরে রেখে এলাম। কুকুরটা তেড়ে গিয়ে প্যান্ট ধরে একটু টান্‌লো, যেন ইয়ারকি করলো।

ছেলেটা কোন দিকে না তাকিয়ে হন-হন করে চলে গেল।

উত্তেজিত হয়ে চেয়ারে এসে বসলাম। মনে নানা কথা উঠতে লাগলো। খানিক পরে উত্তেজনা একটু শান্ত হতে মনে পড়লো সম্পাদক মহাশয়কে যে চিঠিখানি লিখতে বসেছিলাম তা এখনও

লেখা হয় নি। কী লিখবো মনে মনে আওড়াতে লাগলাম—

"প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,

যে দাঁতটি ভাঙবার মতো হয়েছে তা আজও না ভাঙায় বড়ই কষ্ট পাচ্ছি। দন্তযাতনায় গল্পটি লিখে উঠতে পারছি না।

যদি আরও দুটি দিন সময় দেন তো বাধিত হবো।"

কিন্তু কাগজে কথাগুলি লিখতে গিয়ে দেখি আমার কলমটি নেই! টেবিল, টানা, বইয়ের গাদা, কাগজের তাড়া, পকেট, এমন কী ফটকের ধার পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। কিন্তু বৃথা অন্বেষণ! বুঝলাম, ঐ ছোঁড়াটার কাজ। যখন টেবিলের ধারে এসে দাঁড়িয়েছিল তখনই সরিয়েছে। ছোঁড়াটা ভিখারী-বেশে চোর।

ছেলেটা চলে যেতে নাতনীও ভেতরে গিয়েছিল। ফিরে এলো এক পেয়ালা চা ও খান দুই ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট হাতে নিয়ে। টেবিলে পেয়ালা ও প্লেট রাখতে রাখতে বললে, "দাদু, অমন করে কী খুঁজছো?

বললাম, "ভাই আমার সাধের কলমটি। কোথাও পেলাম না। বুঝছি, ঐ ছোঁড়াটাই সরিয়েছে।"

নাতনী খিল-খিল করে হেসে উঠলো, বললো, "দাদু, এতদিন পরে তুমি ঠিক লেখক হয়েছো।"

"কেন? কেন?"

"তোমার কলম যে তোমার কানে। আর মিছিমিছি একজনকে চোর ধরছিলে।"

"কিন্তু প্রথমে তুমিই না ওকে চোর বলছিলে?"

"যার শেষ ভালো তার সব ভালো।" বলে সে ভেতরে চলে গেল।

বুঝলাম, ছেলেটার চোখের জল দিদির মন গলিয়ে দিয়েছে। চোখের জলের এমনি গুণ! কিন্তু আমার কিছু হয় নি। আমি যে হাড়পাকা লেখক!

———

হবি মানে বাতিক

স্বপনবুড়ো

খোদন টিফিনের ঘণ্টায় মাথা নেড়ে বটুককে বললে – ছ্যাখ বটুক, একটা কিছু 'হবি' না থাকলে এই জীবনটাই বৃথা।

বটুক ঠোঁট বেঁকিয়ে উত্তর দিলে, 'হবি'? 'হবি' আবার কি? বরং তার চাইতে বল 'হকি,' এই তো কিছুদিন আগেই ইডেনগার্ডেনে হকি খেলা নিয়ে কি মাতামাতি।

খোদন বেঞ্চের ওপর চাপড় মেরে বললে, দেখ বটুক, তুই হচ্ছিস বিংশ শতাব্দীর একটা অভিনব বোকা! নইলে 'হবি' কথাটার মানে জানিস নে? 'হবি' মানে 'সখ'। প্রত্যেক মানুষেরই একটা করে সখ থাকে। হবির বাঙলা তুই বাতিক করতে পারিস। লোকের নানান রকম বাতিক থাকে! ধর—কেউ গান গায়, কেউ কবিতা লেখে, কেউ ছবি আঁকতে আবার কেউ বা বাগান করে। মাছ ধরার বাতিকও অনেকের আছে।

বটুক ঠোঁটে একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ করলে। তারপর বললে, ও! এই কথা। ব্যাপারটা আগে বললেই হত। হকি নয় হবি। হ্যাঁ, যদি আমায় জিজ্ঞেস করিস তা হলে আমি বলব, আমার হবি হচ্ছে—এসপ্ল্যানেডের মোড়ে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাওয়া—

—দূর-দূর ওটা আবার হবি? একেবারে তৃতীয় বাতিক!

বিরক্তিতে বমি আসছে ঠিক এই রকম মুখের ভাব করে ভুরু কুচকে মন্তব্য করলে খোদন। তারপর একটু চুপচাপ থেকে বললে —আমার কি হবি জানিস?

—কি রে ?

—আমার হবি হবে গান গাওয়া। আমি এখন থেকে গান গাইতে সুরু করবো।

বটুক হাসবে কি কাঁদবে ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারলে না।

বললে—অ্যাঁ! খোদন তুই গান গাইবি ? ব্যাপারটা কি খুলে বল দেখি ? তোকে কোনো দিন হারমোনিয়ামের ধারে কাছে যেতে দেখিনি।

গম্ভীরভাবে খোদন উত্তর দিলে,—দেখিসনি তাতে কি ? কেউ আগে জলে নামেনি বলে জীবনে আর কখনো জলে নামবে না—এটা কি একটা যুক্তি হল ?

বটুক খানিকটা কি ভাবে। তারপর খুশিতে ফানুষেব মতো ফুলে উঠে বললে, হুঁ বুঝতে পেরেছি।

—কি বুঝতে পেরেছিস ?

খোদন যেন মারমুখী হয়ে উঠবে এমনি একটা ভাব।

বটুক কিন্তু এতটুকু দমল না ওর ভাবভঙ্গী দেখে। শুধু ফোঁড়ন কেটে বলে—ইস্কুলের পারিতোষিক বিতরণ সভায় হিমাদ্রির খাতির দেখে তোর মনে এই ইচ্ছে জেগেছে। বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, আমার কথা সত্যি কিনা ?

খোদন বটুকের কথার কোনো জবাব দিলে না, রাগে গরগর করতে করতে চলে গেল আর এক দিকে।

এর দু'দিন বাদে পাড়ার লোকেরা মরিয়া হয়ে থানায় গিয়ে হাজির।

কী তাদের নালিশ ?

সবাই মিলে জানালে যে, খোদনের গলা সাধার দৌরাত্ম্যে সারা দিনের খাটা-খাটনীর পর এ অঞ্চলে কেউ চোখের পাতা এক করতে পারছে না।

একটা ভালো কাজের বিরুদ্ধে পাড়া শুদ্ধ সবাই যে একতাবদ্ধ

হতে পারে। এই তিক্ত অভিজ্ঞতায় খোদন ঘেন্নায় গান গাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলে।

এইবার খোদনচন্দ্র স্থির করলে যে ছবি আঁকবে। যন্ত্রের অসাধ্য কোনো কাজ নেই। কাজেই নিজের বাড়ীতে বসে যত খুশী ছবি আঁকতে পারবে না কেন?

প্রচুর কাগজ এলো, রঙীন পেন্সিল, ক্রেয়ন কেনা হল। সস্, জল রঙ তেল রঙ আয়োজনের কিছুই বাকি রইল না।

খোদনের খেলাধুলা বন্ধ হ'ল, ইস্কুল কামাই করতে সুরু করলে। পড়ার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে সে দিনরাত পেন্সিল আর তুলি চালাতে লাগলো।

এক হপ্তা খাটুনির পর সে এত ছবি এঁকে ফেললে যে, বাড়ীর লোকেরাই তার একাগ্রতা দেখে অবাক হয়ে গেল।

ওর চোখের জ্যোতি কমে যাবে—এই ভয়ে ঠাকুমা খোদনের জন্যে নিত্যি মাছের মুড়ো খাবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

ঠাকুর্দা ছেলেমেয়েদের আর খোদনের বন্ধুদের ধমকে দিলেন, কেউ যেন না ওর ছবি আঁকবার সময় গোলমাল করে। কালে নিশ্চয়ই খোদন দেশের একজন নামকরা শিল্পী হবে। এ সম্পর্কে কারো মনে কোনো সংশয়ই রইল না।

অবশেষে একদিন খোদনের কাকা ইস্কুলের ড্রইং টিচারকে ডেকে নিয়ে গেলেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরে খোদনের আঁকা রাশি রাশি ছবির মধ্যে ডুবে গিয়ে খানিকক্ষণ অভিভূতের মত বসে রইলেন।

খোদনের ঠাকুর্দা উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে এসে বললেন, কি রকম দেখছেন মাস্টামশাই? আমাদের খোদন নিশ্চয়ই একজন দেশ-বরেণ্য শিল্পী হবে?

ড্রইং টিচার তাঁর চশমাটা কপালের উপর তুলে ধরলেন, তারপর মাথা নেড়ে জবাব দিলেন, সবই তো বুঝলাম। কিন্তু প্রত্যেকটি ছবির তলায় স্পষ্ট করে লিখে দিতে হবে—এটা ঘোড়া কি ব্যাঙ।

নইলে লোকে বুঝবে কি করে ?

খোদনের কাকা ড্রইং টিচারের জবাব শুনে প্রথমটা একেবারে হকচকিয়ে গেলেন। তারপর মুখখান বাঁকা করে শ্লেষ দিয়ে বললেন, মডার্ণ আর্টের কোনো খবরই দেখছি মাস্টামশাই রাখেন না। ছবি দেখে সহজভাবে বোঝা যাবে—কলা আর মূলো, খোদনের আর্ট কিন্তু সে স্তরের নয়। আপনি সেকেলে মানুষ, হয়তো মডার্ণ আর্টের কোনো খবরই রাখেন না।

ড্রইং টিচার উত্তর দিলেন, তা হয়ত হবে। না হয় আমার চোখের দোষ হয়েছে।

আর কথা না বাড়িয়ে শিক্ষকমশাই নিজের ছাতাটা হাতে নিয়ে সদর রাস্তায় গিয়ে পড়লেন।

কিন্তু রাগে ফেটে পড়ল খোদনচন্দ্র। রং তুলি ছড়িয়ে ফেলে আঁকা ছবিগুলো ছিঁড়ে কুটিকুটি করে একেবারে হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে বসল।

বললে, না, আর আমি ছবি আঁকবো না।

ঠাকুর্দা ছুটে এলেন, ঠাকুমা ছুটে এলেন। বললেন, তা হলে তুই ইস্কুলে যাওয়াই সুরু কর। মিছিমিছি বাড়ীতে বসে থেকে সময় নষ্ট।

খোদন ফোঁস করে উঠল, ওই ইস্কুলে আমি যাবো ভেবেছ ? যেখানে আমার ছবির আদর নেই, সেখানে আর আমি যাচ্ছি নে !

ঠাকুরর্দা বললেন, তাহলে তুই কি করবি শুনি ? ষাঁড়ের গোবর হয়ে চুপচাপ বসে থাকবি ?

খোদনের মাথায় তখন নতুন প্ল্যান এসেছে। মাথা দুলিয়ে চোখ ঘুরিয়ে বললে, আমি বাগান করবো।

যে কথা সেই কাজ !

খোদনচন্দ্র বাগান করার কাজে লেগে পড়ল। বাড়ীর পেছনে একটা বাগান আগে থেকে ছিল। খোদন কোদাল নিয়ে, মালকোচা

মেরে মাটি কোপাতে সুরু করে দিলে। ফুল তাকে ফোটাতে হবে। নানারকম সার এনে খোদন বাগানের মাটিতে মেশাতে শুরু করলে। এক বন্ধু এল, পরামর্শ দিলে এনতার চুন মিশিয়ে দে সারের সঙ্গে। তাহলে যে কোন ফল-ফুলের গাছ ফন্ ফন্ করে বেড়ে উঠবে। ফুল ফলও ফলবে প্রচুর।

ফুল ফোটাবার মূলমন্ত্র পেয়ে খোদন সারের সঙ্গে রাশি রাশি চুন মিশিয়ে নিলে

এর আগে খোদনের ঠাকুর্দা তাঁর বাগানে অনেক দামী দামী গাছ লাগিয়েছিলেন। এইবার সেই সব গাছের গোড়া খুঁড়ে খুঁড়ে চুন ঢেলে দিতে ছুদিনের মধ্যেই অমন সুন্দর সুন্দর গাছগুলি শুকিয়ে একেবারে আমসী হয়ে উঠলো।

ব্যাপার দেখে ঠাকুর্দা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, বললেন, —ঢের হয়েছে। এইবার ক্ষ্যামা দাও। তোমার আর বাগান করে আমার পিণ্ডি চটকাতে হবে না।

কাজেই খোদনচন্দ্র ছেড়ে দিলো ও পথটাও। বদলে ফেললে মতলবটা।

তারপর কয়েকদিন ধরে খোদনের দেখাই পাওয়া যায় না। পাগলের মতো কোথায় যে ঘোরে কেউ তার হদিশ পায় না। অবশেষে বাড়ীর সবাই একদিন অবাক হয়ে দেখলে খোদনচন্দ্র একটি ময়না যোগাড় করে নিয়ে এসেছে। দিনরাত্তির ঘরের দরজা বন্ধ করে ময়নাকে বলছে—পড়ো, ময়না পড়ো—

ভালো কাজ করিবার বহুৎ বাধা—
কৃষ্ণ নাম সাথে তুমি বলিও রাধা।

ঠাকুরদা মাথা নেড়ে বললেন—এইবার আসল বাতিক হয়েছে খোদনের।

———

ভীরু কাপুরুষ

আশাপূর্ণা দেবী

'বাবা এত টাকা নষ্ট করে কেন যে এত বড় একটা বাড়ী বানাচ্ছেন !' ধ্রুব বলল দুঃখু দুঃখু মুখে,' এর থেকে বাবা যদি একটা রেলগাড়ী বানিয়ে নিতেন।'

শুভো চোখ ড্যাবা করে বলে উঠল, 'বাড়ীর বদলে রেলগাড়ী ? রেলগাড়ীতে থাকতাম আমরা ?'

ধ্রুব জোর দিয়ে বলে, 'নিশ্চয় ! থাকবার পক্ষে ওর থেকে ভাল জায়গা আর কি আছে শুনি ? ওতে থাকতে পাচ্ছিস তুই, আবার দৌড় দিয়ে দিয়ে কাঁহা কাঁহা দেশ চলেও যাচ্ছিস ! ঘরে বসে পৃথিবী দেখছিস।'

কিন্তু দাদা', শুভো সন্তর্পণে বলে, 'রোজ রোজ কি রেলগাড়ীতে থাকা যায় ?'

'যায় না ?' ধ্রুব এই মুখ্যু গাধা ছোট ভাইটার ওপর রেগে আগুন হয়ে উঠে বলে, 'কেন যায় না শুনি ? কী নেই রেলগাড়ীতে ? শোবার জায়গা নেই ? বসবার জায়গা নেই ? চান করবার জায়গা নেই ? আলো নেই ? পাখা নেই ? আর্শি নেই ? কী নেইটা কি তাই শুনি ? একেবারে নিজেদের একলার জন্যে নিজেরা যদি একটা তৈরী করে নেওয়া হয়, অন্য লোক উঠে পড়ে তো ভিড় করবে না ? রোজ রোজ তো টিকিট কাটতে হবে না ?'

শুভো তবুও, অসঙ্কোচে বলে, 'কিন্তু রেলগাড়ী তো যেখানে ইচ্ছে সেখানে যাবে। শুধু তো যাবে. আর যাবে, তাহলে ?'

'তাহলে মানে? সেটাই তো মজা, সেটাই তো আমোদ। যেখানে ইচ্ছে সেখানে গিয়ে তো আর থেমে থামবে না? আবার ঘুরে ঘুরে আসবে, আবার চলে চলে যাবে। বাক্স বিছানা বাঁধতে হবে না, এত এত সব জিনিস কিনতে হবে না, একবার উঠে পড়লেই ব্যস,—সারা জীবন শুধু ঘুরে আর ঘুরে সুখে কাটিয়ে দাও। নেহাৎ জামা জুতোগুলো যখন ছোট হয়ে যাবে, তখন যা একটু অসুবিধে। তা দিল্লী কি কাশী, কি আবার এই কলকাতাতেই একবার স্টেশনে নেমে তাড়াতাড়ি কিনে নেওয়া যায়। বড় ইষ্টিশানে গাড়ী কতক্ষণ থামে দেখিস না?'

দাদার এই উদ্দাম মজার চিন্তাটা অবশ্য ভালই লাগে শুভোর। রেলগাড়ীর মত জিনিষ আর কী আছে? আমি একটি জানলার ধারে বসে আছি আর সামনে পৃথিবী ছুটছে। ছুটে আমার চোখের কাছ দিয়ে পিছিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে মাঠ-বন, নদী-পাহাড়, মন্দির বাড়ী, জল-জঙ্গল কাশফুল, ধানক্ষেত!....ঠিক সিনেমার মত। এ মজার তুলনা হয় না।

শুভোর মামাতো দিদি ঘুন্টি অবিশ্যি একদিন বলেছিল, 'ধেৎ রেলগাড়ীতে আবার আছে কী? ও তো একশো বছরের পুরনো।'

শুনে 'হাঁ' হয়ে গিয়েছিল শুভো। 'পুরনো হয়ে গেছে বলে মজা থাকবে না?' রাগ করে বলেছিলো শুভো, 'ভাত তো দুশো তিনশো হাজার বছরের পুরনো, তুই ভাত খাস না? একদিন জ্বর হলেই তো পরদিন সকাল থেকেই ভাবতে সুরু করিস কখন ভাত খাবো।'

ঘুন্টির ওর রাগ দেখে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল। আর বলেছিল, 'আহা কী তুলনা রে! লোক এখন চাঁদে জমি কিনে রাখবার তাল করছে, বাড়ী বানাবে বলে আর ওই বোকাটা কিনা রেলগাড়ীকে ভাল বলছে! রেলগাড়ী চড়ে তুই ভারতবর্ষের বাইরে যেতে পারবি? হুঁঃ, যদি বা এরোপ্লেনকে ভালো বলতিস তাও একটু মানে হতো।'

কিন্তু শুভো তো এরোপ্লেনের মধ্যে কোন মজা খুঁজে পায় না, বিলেত-টিলেত না হয় না গিয়েছে, দার্জিলিং তো গিয়েছিল একবার প্লেনে চড়ে? মজাটা কি হল? চড়েই মনে হচ্ছিল নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জানালা খুলে মুখ বাড়াবে। তার জো নেই।

তাছাড়া প্লেনে স্টেশনে স্টেশনে জিনিষ কেনা যায়? গোলাপী রেউড়ি? চীনে বাদাম? পাকা পেয়ারা? কাঁচা শশা? তানসেন গুলি? যোয়ান হজমি? পূরি মেঠাই? গরম জিলিপি? গোল গাপপা?

কেনা যায় না।

এরোপ্লেনে এ সব সুবিধে নেই। বাড়ীতেই কি আছে ছাই? বাড়ীতে ওর একটা জিনিষ কিনতে দেবেন বাবা? মোটেই না। সত্যি বলতে পৃথিবীর ওই সব সেরা খাদ্যগুলো লুকিয়েই খেতে হয় শুভো ধ্রুবকে। কারণ, দেখতে পেলে এমন হৈ-চৈ তুলবেন! উঃ!

সেদিন তো দু'আনার দু'পাতা মটর ঘুগনি ফেলাই গেল তাদের। বাবা আসছেন দেখেই দিশেহারা হয়ে জানলা দিয়ে—উপায় কি? বাবা দেখলেই এমন ভান করবেন যেন মারাই গেছে তাঁর ছেলে দুটো এই বিষ খেয়ে!

অথচ—?

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি অথচ—রেল চড়লেই বাবা নিজেই হরদম 'ওলা' ডেকে চলেছেন। এই চা, এই ঘুগনি, এই অবাক জলপান, কিছু না হোক পান-ই। আর আরো অবিশ্বাস্য বাবা নিজেই ধ্রুব শুভোকে চা অফার করছেন, 'কি হে চলবে নাকি এক ভাঁড়? রেল-গাড়ীতে মাটির ভাঁড়ের চা, বেশ একটা ঐতিহাসিক জিনিষ!'

বাবা।

যে বাবা ধ্রুব শুভোকে মার কাছে বসে প্লেটে একটু চা খেতে দেখলেই বলতে শুরু করেন, 'তোমাদের এইসব আদরের কোন মানে

হয় না। চা এমন একটা কিছু অপূর্ব বস্তু নয় যে, না খেলে জীবন বৃথা যাবে।'

নিয়ম ছাড়া কিছু দেখলেই বাবা বিরক্ত হয়। আর রেলে চড়লে বাবা নিজেই মাকে ডেকে ডেকে বলেন, 'রেলে চড়লেই আমার এত খিদে পায় কেন বলতো? গাড়ী যত ঝাঁ ঝাঁ ছুটতে থাকে, আমার পেটও ততই খাঁ খাঁ করতে থ.কে। বেশীক্ষণ গেলেই পেটের মধ্যে খাণ্ডবদাহন স্থরু হয়ে যায়।'

মা বলেন, 'সত্যি, রেলে চড়লেই এত খাই-খাই কর তুমি, আমি তো অবাক!'

বাবা বলে উঠেন, 'খাই খাই খাই খাই, যত খাই, তত চাই, পাই তবু ফের চাই, খাওয়া ছাড়া কিছু নাই।'

হাসির হুল্লোড় পড়ে যায়।

এই হলো—রেলগাড়ীর বাবার মূর্তি।

আর—কলকাতার—এই বাড়ীর বাবা?

অন্য মানুষ! বলতে কি একেবারে বিচ্ছিরী। সকাল থেকে রাত অবধি কাজ আর কাজ, ছুট আর ছুট! ধ্রুবো শুভোদের সঙ্গে কথা কইবার সময় নেই। যদি কইলেন?

'শুভো পড়তে বসনি? ধ্রুব তোমার এবারের রেজাল্টটা কেমন হবে?'

দূর! দূর! দাদা ঠিকই বলেছে বাড়ীর চেয়ে রেলগাড়ী হাজার গুণ ভাল। যত ভাবে, ততই রেলগাড়ীর মহিমায় বিচলিত হয় শুভো! সঙ্গে সঙ্গে দাদার মহিমাতেও।

দাদার মাথাতেই তো এসেছে এটা?

বাড়ীর বদলে একটা রেলগাড়ী বানানো! নিজেদের এক্কেবারে নিজেদের একখানা রেলগাড়ী! একথা ভেবেই আহ্লাদে শরীরের সব লোমকুপগুলো খাড়া হয়ে যায় শুভোর! তবু—

তবু দাদার থেকে বুদ্ধিটা তার চিরদিনই পরিপক্ক তাই বলে ফেলে

'চিরদিন যদি রেলগাড়ীতেই থাকা যায় তাহলে তো স্বর্গের ইন্দ্রই হয়ে গেলাম দাদা, তাই না ? কিন্তু ভাবছি—'

'কি আবার ভাবছিস্ ?

'ভাবছি, রেলগাড়ীতেই সারা জীবন, এর চাইতে ভাল আর কি আছে ? রেলগাড়ীতে আলো পাখা আছেও সব, কিন্তু দোকান, বাজার, ইস্কুল !'

দোকান, বাজার' ইস্কুল ! হায় কপাল !

ছোট ভাইয়ের এই তুচ্ছতায় অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্টোয় ধ্রুব।

'ইস্কুলের কথা ভাবছিস তুই। দেবরাজ ইন্দ্রের সমান হয়েও ওই বাজে জিনিষটা ভুলতে পারছিস না ? ইস্কুল, আফিস, এই সব জিনিষগুলো খুব ভালো না ? খুব চমৎকার ! হুঁ ! বলে—ইস্কুলের হাত এড়াবার জন্যেই যাব—যাকগে ও তোর মাথায় ঢোকানো যাবে না।'

'মাথায় ঢোকানো যাবে না ?'

এই অপমানে শুভো কাঁদো কাঁদো হয়, 'রেলগাড়ী বলে আমার প্রাণের মত ! দিন রাত্তির শুধু রেলগাড়ী চড়ছি এ ভেবে বলে আমার—'

'থাম ছিঁচকাঁদুনে ! তাহলে বলছিস কেন, বাজার, দোকান হেন-তেন ? বাজারের কী দরকার রে ? রেলগাড়ীতে থালা সাজিয়ে খেতে দিয়ে যায় না ? রেলগাড়ী থেকে রাজ্যির জিনিস কেনা যায় না ?'

'সে তো যায়ই।'

'তবে ?'

শুভো একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'তাহলে কি হবে দাদা ? বাবা তো সব টাকাই ওর বাড়ী-টাড়ি করে ফুরিয়ে ফেলবেন ! রেল-গাড়ী বানানোর টাকা থাকবে না !'

"থাকলেও করবেন না !" ধ্রুব ধ্রুবসত্যের স্বরে বলে, "বুদ্ধি

বলে কোনো জিনিস তো আর থাকে না বড়দের; কিসে মজা, কিসে আমোদ, কিসে শান্তি তার কিছু বোঝে বড়রা? বোঝে না, যাতে কষ্ট, তাতেই মন। একধার থেকে দেখে যা তুই বড়দের, যাতে কষ্ট পাচ্ছে তাই করে চলেছে।'

শুভো একথা অস্বীকার করতে পারে না।

নিজের পক্ষেই তো দেখেছে, দেখছে। এই তো দিদিটা ছিল বাড়ীতে? বাড়ীর লোক বাড়ীতেই থাকবে। তা নয়—তাকে বিয়ে দিয়ে শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হল! অথচ আবার মজাটা দেখ, শ্বশুর বাড়ী পাঠানের সময় কেঁদে কেঁদে নাক মুখ ফুলিয়েই ফেললেন মা! বাবাও প্রায় কাঁদো কাঁদো। শুভো ধ্রুবই কি চুপি চুপি তাই করেনি? দিদির তো কথাই নেই! এই কাণ্ডর কিছুই তো হত না, যদি দিদির বিয়েটা না দেওয়া হতো! কী দরকার ছিল বাপু বাড়ীর মেয়েটাকে পরের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে কেঁদে নাক ফোলানোর? বুদ্ধি থাকলে করে কেউ এমন কাজ?

সর্বদা! সর্বদাই ডেকে ঝঞ্ঝাট আনছে বড়রা। এই তো আজ সকালেই ছুটির দিন মা বাবা ছোট কাকা বেশ জমিয়ে বসে গল্প করছিলেন, শুভো ধ্রুব মোহিত হয়ে বসেছিল, হঠাৎ মা বলে বসলেন, 'পিশেমশাইয়ের জ্বর শুনেছিলাম একবার দেখতে যাওয়া উচিত।'

বাস, হয়ে গেল।

ভেঙে গেল আড্ডা!

চললেন দুজনে 'উচিত' করতে সেই দমদম না পাকপাড়া কোথায়। অকারণ ধ্রুবকে খুব খানিকটা শাসিয়ে গেলেন যেন ঝগড়া না করে, যেন পড়তে বসে, যেন রাস্তায় না বেরোয়।

হলটা কি শেষ পর্যন্ত?

না, মার সেই কালো মোটা গুঁফো পিসেমশাইকে একটু দেখে আসা হল।

জ্বর ?

সে তো ছেড়েই গেছে।

দূর ! দূর শুধু কষ্ট পাবার জন্মেই। 'উচিত ! উচিত !' যেন শুধু কষ্ট পাওয়াই উচিত মানুষের।

যা ভালো লাগবে তা করা চলবেনা ! এতেও বলতে হবে বুদ্ধিমান ?

না, দাদার কথাই ঠিক !

'দেখ শুভো'—বলল ধ্রুব, 'বাবা রেলগাড়ীর কথা শুনলে স্রেফ হেসে ওড়াবেন, তার চেয়ে—'

'কী দাদা ?

শুভো চোখ ড্যাবা করে।

'তার চেয়ে আমরাই বেরিয়ে পড়ি। যেখানে ইচ্ছে সেখানে চলে যাই—বাবা মা যদি খোঁজেন, যদি খুঁজে বার করতে পারেন, বলবো—আমাদের চাও তো একটা রেলগাড়ী বানাও, সারা জীবন সেই গাড়ী চড়ে আমরা শুধু চলবো আর চলবো, ঘুরে ঘুরে আসবো আবার যাবো, চলা আর ফুরোবেই না।'

একেবারে নিরুদ্দেশের মত মজা হবে। আর দেখা না হলে তো স্রেফ্ নিরুদ্দেশই ! সেও মজা !

শুভো ভয়ে ভয়ে বলে, 'তোর সাহস আছে দাদা ?'

'সাহস নেই ? সাহস নেই মানে ? চল না দেখবি সাহস আছে কি না আছে !'

'কিন্তু টাকা ?'

'টাকা ! টাকা আবার কি ? বলবো আমরা ছোট ছেলে টাকা কোথায় পাবো ? আর কতই বা জায়গা নেবো আমরা ? জিনিস নেই পত্তর নেই !'

'তাহলে চল !'

তা হলে চল।

মানে চিরকালের মত চল।

বাবা মা যদি খোঁজেন আর যদি খুঁজে পান তবেই হয়তো আবার দেখা হবে। না হলে নয়।

আজই শেষ দেখা।

শুভো খেতে বসে মায়ের মুখের দিকে তাকায়, আর হঠাৎ যেন বুকের ভেতরে কী একটা ঠেলা দিয়ে ওঠে তার। রুটি আর গলা দিয়ে নামতে চায় না। কাল সকালে আর দেখতে পাবে না মাকে। কাল না, পরশু না, তর্সু না!....কোনো দিনই না।

হঠাৎ মা বলে ওঠেন, 'ওরকম করছিস্ কেন রে শুভো? রুটি মুখে দিচ্ছিস আর ফেলে দিচ্ছিস?

শুভো কষ্টে বলে, 'পেট ব্যথা করছে।

পেট ব্যথা!

'সর্বনাশ! খাসনি, মোটে খাসনি আর। চট্ করে শুয়ে পড়গে যা!'

বাবা বলেন 'পেট ব্যথা করবে তার আর আশ্চর্য কি, দেখ ক' আনার ফুচ্কা পেটে অবস্থান করছে।'

শুভো এর প্রতিবাদ করে না। বাবার মুখের দিকে তাকাতেই পারে না। বাবাকে যে এত ভালবাসতো শুভো তা তো জানত না কই?

আশ্চর্য, দাদা বেশ পাত ফর্সা করে ফেললে, নাঃ, দাদা সত্যিই সাহসী, সত্যি বীর। দাদা যদি বুঝতে পারে শুভোর পেট ব্যথা করেনি, শুধু মা বাবাকে দেখতে পাবে না বলেই—কী লজ্জা দেবে দাদা শুভোকে।

দাদার সামনে কি করে শক্ত থাকবে, তাই ভাবতে ভাবতে শুতে যায় শুভ। তাদের নিজেদের ঘরে। সে ঘরে শুভো আর ধ্রুব শোয়।

শুয়ে শুয়ে মনে বলে, 'হে ভগবান, আমাকে সাহসী করে দাও।'

একটু পরে ধ্রুব এসে ঢোকে।

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

বেশ জ্যোৎস্না-জ্যোৎস্না রাত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মন্দ নয়। শুভো চোখ গোল করে দেখে দাদা কি যেন পকেট থেকে বার করে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে। রাত দুপুরে কী ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে দাদা?

ধড়মড় করে উঠে আসে শুভো।

চুপি চুপি বলে, 'কী দেখছিস রে দাদা?'

ধ্রুব একটু ঘুরে দাঁড়ায়।

চড়া গলায় বলে ওঠে, 'সব তাতে দরকার তোর? ফেলছিলাম রুটি। বুঝলি? রুটি আলুর দম! হলো?'

'রুটি! আলুর দম!

শুভো হাঁ হয়ে গিয়ে বলে ওঠে, 'পকেটে রুটি আলুর দম রেখে-ছিলি তুই?

ধ্রুব আরো চড়া গলায় বলে, 'হ্যাঁ, রেখেছিলাম। কী করবি? চিরকালের মতন চলে যাচ্ছি কাল, জন্মে আর মা বাবাকে....বসে বসে রুটি খেতে পারে মানুষ।

চড়া গলা হঠাৎ গলে জল হয়ে গলার স্বরটাই বন্ধ করে দেয়। ঝপ করে বিছানায় শুয়ে পড়ে একটা চাদর নিয়ে মাথা অবধি ঢাকা দেয় ধ্রুব।

শুভোও মলিন মুখো শুয়ে পড়ে।

এবং দাদার মতই কাজ করতে থাকে সে।

অনেকক্ষণ পরে খাট বিছানা নড়া বন্ধ হয়। শুভো আস্তে ডাকে, 'দাদা! দাদা নীরব।

শুভো চাদরের ওপর থেকে নাড়া দেয়, 'দাদা, ভেবে দেখছি

আমরা যদি চিরকালের মতন চলে যাই, তাহলে তো সেই বড়দের মত বোকাই হলাম। যাতে কষ্ট তাই সেধে সেধে করা হল।

ধ্রুব হঠাৎ উঠে বসে!

আন্দাজে শুভোর পেটে পিঠে কোথায় যেন একটা চড় বসিয়ে দেয়, ভাঙা ভাঙা চড়া গলায় বলে ওঠে, 'জানি জানি, তোর জন্যেই আমার নিরুদ্দেশ যাওয়া হবে না, ঠিক জানি। ভীরু কাপুরুষ কোথাকার।'

তিন আনার আমের জন্য

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি আর হারু বাবু ঝোলা-লাগানো আঁকশি দিয়ে একটার পর একটা পাকা আম পাড়ছেন। খাসা আমগুলো! এত দূরে দাঁড়িয়েও আমের গন্ধে আমার প্রাণমন উদাস হয়ে যাচ্ছে।

আর একটা সোনালি রঙের আমকে ঝুড়িতে সাজিয়ে রেখে হারুবাবু বললেন,—কি হে প্যালারাম, অমন জুলজুল করে তাকিয়ে দেখছ কী—অ্যাঁ?

আমি বললুম,—কিছু না।

—কিছু না?—হারুবাবু এমন হেঁ হেঁ করে হাসলেন যে আমার পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে গেল: মিথ্যে নজর দিয়ে কষ্ট পাচ্ছ কেন—শুনি? এ আমগুলো বাজারে পাঠাব—টাকায় ছ'টা বিক্রী হবে।

—হোক্ না বিক্রী—আমার কী?—আমি ব্যাজার হয়ে জবাব দিলুম।

—তোমার কী? তা বটে। বেল পাকলে কাকের কিছু আসে যায় না বটে!—হারুবাবুর মুখে আবার সেই গা-জ্বালানো হাসি।

আমার অপমান হল। হাঁড়ির মতো মুখ করে বললুম, ও আম আমি খাই না।

—পেলে তো খাবে? যাও—যাও—মিথ্যে এখেনে দাঁড়িয়ে থেকে আর কষ্ট পেয়ো না।—বলে আবার আঁকশি দিয়ে আর একটা পাকা আম নামাতে লাগলেন।

আমি গেলুম না। বাগান হারুবাবুর বটে, কিন্তু রাস্তাটা তো মিউনিসিপ্যালিটির। সুতরাং আমি যতক্ষণ ইচ্ছে দাঁড়িয়ে থাকব, যত খুশি নজর দেব। হারুবাবু বললেই যাচ্ছি আর কি! যেতে বয়ে গেছে আমার!

বিচ্ছিরি কিপটে এই লোকটা! টাকার আণ্ডিল—অথচ প্রাণে ধরে একটা পয়সা খরচ করবেন না। আমাদের এই শহরের ভিখিরীরা পর্যন্ত ওঁর দোরগোড়ায় যায় না—পাছে ঝুলি ফেঁসে যায়। সরস্বতী পুজোর চাঁদা চাইতে গেলে বেরিয়ে আসে স্রেফ দুটো নয়া পয়সা। তা হলেই বোঝো।

হারুবাবু আমাকে আম খেতে দেবেন এ আশা আমার কোনদিনই ছিল না কিন্তু অমন খাসা টুকটুকে আম—গন্ধে চারদিক ম-ম করছে, প্রাণ ভরে দেখতে দোষটা কী! আমিও তাই দেখছিলুম আর মনে মনে ভাবছিলুম একটা নীরেট কাঁচা আম যদি অনেক উঁচু থেকে টপাক করে ওঁর টাকের ওপর পড়ে— বেশ হয় তা হলে!

এক-একটা করে পাকা আম হারুবাবুর আঁকশির ঝোলায় নামছে, আমি হাঁ করে দেখছি—ঠিক তখন—

রামছাগলটা কখন গুটি গুটি পায়ে ঝোপের আড়াল থেকে এগোচ্ছিল আমরা কেউই দেখতে পাইনি। কিংবা ছাগলের গতিবিধি কে-ই বা দেখতে পায়। ছোট ছোট চারটে পা, এক গাল দাড়ি আর দু'ইঞ্চি একটা ল্যাজ নিয়ে চিরকাল ওরা আমার কাছে এক দারুণ রহস্য। ওরা পৃথিবীর সব জিনিষ খেয়ে থাকে, কিন্তু বাঘ ধরে খেতে পারে না কেন এবং বাঘেই বা পাল্‌টা ওদের ধরে খায় কেন—এ সমস্যার সমাধান আমি কখনো করতে পারিনি।

হঠাৎ হারুবাবুর হায় হায় হায় চিৎকারে আমার চমক ভাঙল।

—ধরো ধরো প্যালারাম—নিলে—আম নিয়ে গেল—তিন আনার আম নিয়ে গেল একটা—

তাকিয়ে দেখি সেই চির রহস্যময় ছাগল। একটা আম গালে

পুরে সে ছুটছে, তার মিহি দাড়ি ফুরফুর করে উড়ছে হাওয়ায়, দু'ইঞ্চি ল্যাজটা রেলের টিকিটের মতো উঁচু করে মেল ট্রেনের মতোই সে ধাবমান।

—ধরো প্যালারাম—তারস্বরে ডাকলেন হারুবাবু। ছুটতে ছুটতে আমায় বললেন,—ধরতে পারলে কেটে খাব ব্যাটাকে—তোমাকেও ভাগ দেব।

এটা ভালো প্রস্তাব। আমারও উৎসাহ এসে গেল

কিন্তু ছুটন্ত ছাগলকে—বিশেষ করে রামছাগলকে কে ধরতে পারে উড়ন্ত পাগল ছাড়া ? আর পাগল কখনো উড়তে পারে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। কারণ কোনো উড়ন্ত পাগল আমি কোনোদিন দেখিনি।

অতএব আধ মাইলখানেক ছোটবার পরে ছাগল যখন দিগন্তে বিলীন হল, তখন হারুবাবু আবার হাহাকার করে উঠলেন।

—গেল প্যালারাম—সর্বস্ব গেল আমার।

—কেন গেল, কোথায় গেল, কবে গেল ?—ছাগল ধরবার আশায়, মাংসের লোভে আমি তখনো ছুটছি—হাঁপাতে হাঁপাতেই জানতে চাইলুম : কোন্ ট্রেনেই বা গেল ?

—ধুত্তোরি !—হারুবাবু আমার ঘাড় চেপে ধরলেন : চুলোয় যাক তোমার ট্রেন ! ফেরো—ফেরো ! গোরু—গোরু এসে পড়েছে !

—কোত্থেকে পড়ল ?

—তোমার মুণ্ডু থেকে।—হারুবাবু আমাকে টানতে টানতে আবার বাগানের দিকে ছুটলেন। চিৎকার করে বলতে লাগলেন : পালা—পালা—হেট্ হেট্ ! গেল প্যালারাম—আমার সব গেল !

তখন আমি দেখতে পেলুম। আমরা যখন ছাগলের পেছনে ছুটেছি সেই সময় গোরু এসে পড়েছে আমের গন্ধে। আর নিশ্চিন্তে ল্যাজ দিয়ে মাছি তাড়াতে তাড়াতে সোজা এগুচ্ছে হারুবাবুর আমের ঝুড়ির দিকে।

হারুবাবু আবার গগনভেদী চীৎকার করলেন ঃ হেট্ হেট্—পালা—পালা—

অত দূরের হাঁকে গোরুর কিছুমাত্র বিকার দেখা গেল না। পরিষ্কার দেখতে পেলুম আমের ঝুড়ির ওপর তার মুখখানা গভীর মনোযোগের সঙ্গে নেমে গেল।

হারুবাবু একটা খাবি খেলেন!

—এক গ্রাসেই তো তিনটে খেয়ে নেবে—অ্যাঁ! হেট্—হেট্—ভাগ—

বলেই মাটি থেকে কী কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিতে চাইলেন গোরুর দিকে। কিন্তু সেটা গোরুরই খানিকটা কাঁচা গোবর—ঘাস হারামি করতে রাজী হল না। উল্টে হারুবাবুরই হাতে-টাতে লেগে গেল।

—উঃ—কী গন্ধ! ধরো প্যালারাম—ধরো। ওই—ওই আবার খাচ্ছে! ওফ—আরো তিনটে। পুরো এক টাকার আম খেয়ে নিলে যে!—হারুবাবু ডুকরে উঠলেন।

আমরা এসে পড়েছি দেখে গোরুও ছুট লাগালো।

—ধরো, গোরু ধরো—প্যালারাম—কুইক্!

—গোরু ধরে কী হবে?—আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলুম ঃ ওরও মাংস খাবেন নাকি?

—ওয়াক থু—রাম রাম! হিঁদুর ছেলে না আমি?—গোরুকে তাড়া করতে করতে হারুবাবু বললেন,—খোঁয়াড়ে দেব ওটাকে—খোঁয়াড়ে। অন্ততঃ আটগণ্ডা পয়সা উশুল হবে। তা থেকে দু'আনা তোমাকেও দেব। ছোটো—ছোটো—

দু'আনা! তাই বা মন্দ কী। খামোকা দু'আনা পয়সাই বা আমায় দিতে যাচ্ছে কে! আবার গোরুর পেছনে ছুট লাগালুম দু'জনে।

কিন্তু ছুটন্ত ছাগলকে যদি উড়ন্ত পাগল ছাড়া কেউ ধরতে না পারে, তবে দৌড়বাজ গোরুকে কে ধরতে পারে ধড়ীবাজ গোঁয়ার-

গোবিন্দ ছাড়া ? পাগল ছুটেছিল মেল ট্রেনের মতো, গোরু ছুটল জেট্ প্লেনের মতো। পেছনের ল্যাজটা তার জয়ধ্বজার মতো উড়তে লাগল।

—ধর—ধর—ধর—

ধরা গেল না। গোরুকে ধরে খোঁয়াড়ে দেবে—গোঁয়ার ছাড়া এমন গোঁ আর কার আছে ?

অগত্যা গোঁ গোঁ করতে করতে ফিরে এলেন হারুবাবু। দু'আনার আশা ছেড়ে আমাকেও ফিরতে হল। গোরুতে ক'টা আম খেয়েছে কে জানে। ঝুড়ির অনেকখানিই সাফ !

হারুবাবু সোজা চোখ বুজে আমগাছতলায় শুয়ে পড়লেন।

—গেল প্যালারাম, কম্‌সে কম দু'টাকার আম আমার গেল।

কী আর করি ! একটা ডাল কুড়িয়ে হারুবাবুর মাথায় হাওয়া দিতে লাগলুম !

আরো একটা জিনিষ আমি দেখেছি। একটা কুকুর হারুবাবুর একপাটি নতুন চটি নিয়ে পালিয়েছে।

কিন্তু কুকুর ধরে লাভ কি ! তার মাংস খাওয়া যায় না—তাকে খোঁয়াড়েও দেওয়া যায় না বোধ হয়। আর পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত জুতো নিয়ে পলাতক কুকুরকে কে-ই বা ধরতে পেরেছে ? কোনো উড়ন্ত পাগলও নয়—কোনো ধড়ীবাজ গোঁয়ারগোবিন্দও নয় !

তা ছাড়া শকটা একটু সামলে নিন হারুবাবু। এই মুহূর্তে দুঃসংবাদটা দিয়ে ওঁর অপঘাত ঘটিয়ে কী হবে ?

বক-আহাম্মক

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

ছোটবেলার জীবনকথা বলতে কার না ভাল লাগে ? এমন সুখের দিন তো আর সারা জীবনে পাওয়া যায় না। ছোটবেলা কারো সুখে কাটে, কারো দুঃখে কাটে, তবুও ছোটবেলা জীবনের শ্রেষ্ঠ বেলা—অমৃতময় কাল। আমারও ছোটবেলা ছিল—সুখে দুঃখে কেটেছে। আজ স্মৃতির পাতা থেকে তার কিছু কাহিনী শোনাব, শোন।

আমার বয়স তখন মাত্র বারো বছর—স্কুলে পড়ি। হঠাৎ একদিন একটি ছাত্র এসে আমাদের ক্লাসে ভর্তি হলো—রং কালো, খোঁচা খোঁচা চুল—কিন্তু চোখ বড় বড়। চোখের জন্যই ওর চেহারাটা সুন্দর হয়ে উঠেছে। বেশ লাগলো ছেলেটাকে। সবাই আমরা আলাপ করলাম তার সঙ্গে। সেও খুব চটপট ভাব জমিয়ে বসলো। ছেলেটা গুণবান। সে আড়বাঁশী বাজাতে পারে, শ্যামাপাখীর মত শিস দিতে পারে, কুকুরের মত ডাকতে পারে—সে ডাক এমন যে গাঁয়ের নেড়ী কুত্তাগুলো সমানে তার সঙ্গে ডাকে। এমন ছেলেকে যে আমরা ভালবাসবো তার আর বেশী কি ?

ওর নামটাও বড় ভাল—পদ্মনাভ। এ রকম নাম আমাদের গ্রামে তো নাই-ই, আমরা শুনিও নি এর আগে। পদ্মনাভ বললো যে সে তার মামার বাড়ী পুরুলিয়ায় থাকতো। খুব আদরেই ছিল কিন্তু এখানে বনকাঠিতে তার নিজের বাড়ীতে এখন আসার কারণ তার মা একলা থাকে। দাদা গেছে জামসেদপুরে চাকরি করতে—বাবা তো

অনেক আগেই গেছেন স্বর্গে। সুতরাং মামার বাড়ী ছেড়ে আসতে হলো তাকে তবে মামার বাড়ীতে সে এমন একটা বিদ্যে শিখেছে যাতে সে রোজগার করতে পারবে।

কি রে কি ? কি বিদ্যে ?—সাগ্রহে শুধোলাম আমরা।

পদ্মনাভ অর্থাৎ 'পদ' তার মস্ত মাথাটা নেড়ে বললো—নাঃ, ওসব এখন বলা হবে না। তোরা শুনবার যোগ্যই নোস।

আমরা সব জব্দ হয়ে গেলাম। শহর পুরুলিয়ায় থাকে পদ্মনাভ। নিশ্চয় আমাদের থেকে অনেক বেশী গুনবান ও বলবান। আমরা তো তার কাছে ঘুঁটেমাটি! অতএব আর কি করা যায়।

সবাই চলে গেলে আমাকে বললো পদ্মনাভ—শোন ভাই, কারণ তোকে বলবো—হ্যাঁ, তোকেই বলবো।

—বল—

—না, এখন না। শনিবার ছুটির পর তোর বাড়ী গিয়ে বলবো।

আজ মঙ্গলবার—শনিবার আসতে দেরী আছে, তবুও বললাম—চল পদ, আমাদের বাড়ী চল। ওখানে জলখাবার খেয়ে বাড়ী যাবি। চল—পদ, কি ? চল তা হলে।

পদ আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ী এলো এবং দু মিনিটেই আমার মাকে প্রণাম করে মাসিমা পাতিয়ে এমন জমিয়ে তুললো যে মা ওকে বেশী করে খানিকটা দুধ আর দুটো পাকা কলা দিয়ে চিড়ে-দুধ খাওয়ালেন! পদ আনন্দে ঢেকুর তুললো।

—আবার এসো পদ!—মা বললেন।

—আসবোই তো। এ তো আমার মাসিমার বাড়ী—আসতে আর বাধা কি ?

পদ সেদিন চলে গেল বাড়ী। মাত্র মাইল দুই দূরে বাড়ী তার বনকাঠি গাঁয়ে—আগে অবশ্য যাই নি কোনো দিন সেখানে।

শনিবার এলো পদ। নিজেই বললো—আজ তোকে বলবো—চল, মাসিমার কাছে যাই।

এলো পদ। এসেই বসে গেলে জলযোগে। সেটা সারা হলে শুধোলাম—এবার বলবি তো ?

—না—হলো না। খেয়ে আর বলা হয় না। তবে জিনিসটা কি তা তোকে আজই জানাচ্ছি। চল ঐ জামতলায়।

আমাদের অনেক বড় উঠোনের এক কোণায় একটি জামগাছ ছিল। তারই তলায় এলাম আমরা। পদ ওখানে বসে বললো—আমি ভূত নামাতে পারি।

—ভূত ?

—হ্যাঁ—ভূত। যে ভুত তাকে যা চাইবি এনে দেবে। অসুখ ভাল করে দেবে—অমাবস্যের রাত্রে আলো নিয়ে পথ দেখাবে আর—

—আর কি ?—সাগ্রহে শুধোলাম আমি।

—আর শোন—তাড়াতাড়ি সব জবাব সেই লিখে দেবে তোকে আর কিছু করতে হবে না! শুধু তার তোয়াজ করতে হবে। খাওয়াতে হবে।

—কি খায় ?

—কি খায় ? মাছ-মাংস, দুধ-কলা, সন্দেশ, রসগোল্লা, দৈ।

—কি করে খাওয়াবো ? কোথায় তাকে পাবো ?—শুধোলাম আমি।

আহাম্মক—তাকে কি এমনি পাওয়া যায়। আনতে হবে—

—মোটরগাড়ী—না ঘোড়ার গাড়ী, নাকি পাল্কীতে আসে ?

—দুর বোকারাম! সাধনা করে আনতে হয়—সাধনা চাই। আমার ছোটমামা—পুরুলিয়ার যিনি ভূত মহারাজ নামে খ্যাত তিনিই আমায় শিখিয়েছেন—শিখবি ?

—হ্যাঁ—শিখবো কে শেখাবে ?

—আমি—আমি তোর গুরু হবো—এই জামতলাতেই আসন করা হবে। সুন্দর জায়গা। আমার পোষা ভূতের নাম 'কাকরাজ'।

সে এখানে এলে খুব ভাল থাকবে। তার জন্য আমি ভাল একটা আস্তানা খুঁজছিলাম। তোদের এই জামগাছটা খুব আমার পছন্দ হয়েছে।

—তা বেশ—কিন্তু ভূতরা তো শুনেছি শ্যাওড়াগাছে থাকে।

—না রে বোকা না—শ্যাওড়াগাছে থাকে পেত্নী। আমার ভূত পুরুষভূত, ভাল ভূত। কারো ঘাড় মটকায় না—তবে তার খাবার বেশী লাগে।

—লাগুক, আমি দেবো। কি কি চাই বল—আমি যোগাড় করবো।

—চাই একটা নতুন ভাঁড়—সিন্দূর-আলতা-কড়ি ঝিনুক আর একটা মড়ার হাড়। মন্ত্র চাই—তা সে আমি লিখে আনবো।

—মড়ার হাড় কোথায় পাবো ?

—ও তো আমি আনবো—তবে শোন। কেউ যদি জানতে পারে তা হলে আর বাঁচোয়া নেই—এ অতিশয় গোপন কাজ। তোর বাবার পয়সা আছে—তুই একটি মাত্র ছেলে তুই পারবি।

—হুঁ কোথায় পাবো এসব ?

—সে আমি করবো। ঐসব বস্তু আর মন্ত্র লিখে এইখানে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে। রোজ ভোগ দিতে হবে—আর ভোগের প্রসাদ আমাকে খাওয়াতে হবে—আমি তোর গুরু। অবশ্য তুইও প্রসাদ পাবি।

—কিন্তু রোজ ওরকম করে ভোগ দিলে মা-বাবা জানতে পারবে।

—পারবে না! তোকে বেশী কিছু করতে হবে না—তুখানা জিলিপি বা তুটো মেঠাই কিংবা তুটো রসগোল্লা—তাও না জোটে তো তুটো আম বা কলা-চিড়ে-মুড়ি ভাজা আমার জন্য নিয়ে যাবি স্কুলে। অবশ্যি শনি আর মঙ্গলবার তো আমি আসবোই—আসতেই হবে, কিন্তু সে তো বিকালবেলা—সকালের ভোগটা তুই স্কুলে নিয়ে যাবি।

—হ্যাঁ তা হতে পারে—কত দিন লাগবে ?

—তা কি বলা যায় ? ভূতবাবার ইচ্ছে সেটা—তবে মাস ছয় তো বটেই।

আর কিছু বললাম না। পদ সেদিনের মত বাড়ী গেল। পরের মঙ্গলবারে এলো সে আমার সঙ্গে। জলযোগ সেরে জামতলায় গিয়ে বললো—আমি ভূতবাবাকে আনবো। তুই ভয় পাসনে—উনি এসেই কিছু আমাদের দেবেন ! দুজনে হাত ধরাধরি করে আয় কিছুক্ষণ ধ্যান করি।

—কি ধ্যান ? শুধোলাম।

—আমি ভূতবাবাকে ধ্যান করবো, তুই ধ্যান কর আম-কাঁঠাল-লিচু-আপেল-আঙ্গুর-আনারস—যেন থালায় সাজিয়ে খেতে দিচ্ছিস ভূতবাবাকে।

দুজনে বসে গেলাম হাত ধরে। কিছুক্ষণ পরে একটা শব্দও শুনলাম। চোখ চেয়ে ফেললাম আমি। পদও চাইল। বললো—ভয় নেই, ভূতবাবা এসেছেন—ওখানে আমাদের জন্য কিছু রেখে দিলেন, দেখ তো কি দিলেন ?

—কোথায় দেখবো ?

—জামগাছটার ডালে ঐ যে কোটর রয়েছে ঐখানেই দেখ।

গাছে উঠে পড়লাম আমি। কোটরটা বড় নয়, কিন্তু ওরই মধ্যে একটা বেশ বড় কাশীর পেয়ারা। এরকম আমাদের দেশে হয় না। আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বললাম—কি করবো পেয়ারাটা ?

—নিয়ে আয়। দুজনে প্রসাদ নেবো !

প্রসাদ অবশ্য নিলাম, তবে ওর বারো আনা পদই খেলো। আমি কিছু বললাম না। পদর উপর ভক্তি বেড়ে গেল আমার। সে বললো—মড়ার হাড় আমি আনবো। বাকী জিনিস তুই যোগাড় কর। আসছে মাসে অমাবস্যে রবিবার আছে, সেই দিন—বুঝলি।

পদ চলে গেল। একটা মাস গোটা। তবে অমাবস্যার রবিবার যখন আর নেই তখন কি আর করা যায়। ভূতবাবাকে আনবার

যোগাড়ে আমি ব্যস্ত রইলাম—পয়সাও জমাতে আরম্ভ করলাম—কারণ ভুতবাবার ভোগ চাই। পরীক্ষার আগেই যদি ভূতবাবাকে পাই তো আর ভাবনা থাকে না। পদ অবশ্য প্রতি শনি-মঙ্গলবার আমাদের বাড়ীতে আসে, যায় যার কাছে, এবং আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলে যায়। এই রকম চলছে।

অবশেষে এলো আশ্বিন মাসের অমাবস্যের রবিবার। সেদিন মহালয়া—অতএব খুব শুভ দিন। পদ আমাদের বাড়ীতে আজ আসবে, খাবে—আমার কাছে শোবে—কাল একসঙ্গে খেয়ে স্কুলে যাবে—এই ঠিক আছে।

ত্বপুর রাতে পদ আমাকে নিয়ে গেল জামতলায়। ওখানে সবই ঠিক করা ছিল। একটা নতুন ভঁাড়ে সব বস্তুগুলি ভরে একটা মড়ার হাড়ও তার সঙ্গে দিয়ে সরা চাপা দিল পদ—তারপর বাব্‌লা অাঁঠা দিয়ে সরাটা জুড়ে দিল ভঁাড়ের মুখে ; বললো—এই রইল ভুতবাবা —আসুন, দয়া করে শিগ্রি আসবেন। আপনার পূজোর কোনো ক্রটি হতে দেবো না—'জয় বাবা বকরাজ।'

—বকরাজ কে ?—শুধোলাম আমি।

—তোর ভূতবাবার নাম। রোজ ভোগ দেবার সময় ডাকবি—জয় বকরাজ !

—মন্ত্রটা কি ?

—'বকরাজায় নমঃ'—ব্যাস জপ করবি, অন্ততঃ দশবার—কেমন ?

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে এসে শুলাম ত্বজনে রাত্রে আর কোন কথা কইলো না পদ। বললো, ভূতের ভরে গা ব্যথা করছে—ঘুমুলো !

রোজ সকালে আমি বকরাজের পূজো করি, জপ করি, ভোগও দি, যেদিন যেমন পারি। সেই ভোগ নিয়ে যাই স্কুলে। পদই তা খায়। আমাকে এক আধ টুকরো দেয় কোনো দিন !

পরীক্ষার পূর্বে যদি ভূতবাবা এসে যায় তো আর ভাবনা কি। তাই রোজ ডাকি—'এসো বাবা বকরাজ—দয়া করো বাবা।'

না—এলেন না! পরীক্ষা এসে গেল। নিজের বুদ্ধিতেই লিখে এলাম। এই সময়টায় প্রতিদিন পদ আমার দেওয়া ভোগের প্রসাদ খাচ্ছে। শনি-মঙ্গলবার বিকেলে এসে মার কাছেও যায়।

নিত্যই ভোগ দিয়ে যাচ্ছি ভূতবাবার, কিন্তু তাঁর দয়া তো হচ্ছে না। পরীক্ষার ফল বেরুলো। পাসটা করে ফেলেছি কোন রকমে —পদ্মনাভও পাস করেছে। আমার থেকে বেশী নম্বর পেয়েছে সব বিষয়ে। বললো,—ভূতবাবা কাকরাজের দয়া জানিস? তোর ভূতবাবা এলে তুই হয়তো ফ্রাস্ট হতে পারতিস, কারণ তুই আমার থেকে বুদ্ধিমান ছেলে।

প্রশংসাটা করলো কিন্তু আমার আত্মগৌরব জাগলো না। বললাম,—আর বুদ্ধিমান কোথায়? ভূতবাবাকে তো পাচ্ছি না।

কথাটা মর্মান্তিক দুঃখেই বলেছিলাম। পদ হাসলো; বললো শোন, আমার ভূতবাবা কাকরাজ, তোর ভূতবাবা বকরাজ কাকরাজ উড়ে উঠে খাবার খোঁজে, বকরাজ ধীর স্থির জলের ধারে বসে থাকে, সাবনা করে। তাই তোর ভূতোবাবার জন্য সাধনা কিছু বেশী দরকার।

—কি করবো? কি করতে হবে?

—কর কিছু! কাল তুই ভাল করে ভূতবাবাকে ভোগ দে। পোলাও হলেই ভাল হয়, না হলে লুচি-মাংস! তবে পোলাও ভূত-বাবা খুব ভালোবাসেন। মাকে বল না পোলাও খাবো—তোর জন্য তো তোর মা বাবা চাঁদ কিনতে পারে।

কথাটা খুব মিথ্যে নয়—আমি মা-বাপের একমাত্র ছেলে, তবু বললাম—কাল তো বিষুৎবার—শনি মঙ্গল তো নয়।

—তা হোক, বিষুৎবার ভাল বার—গুরুবার, ভূতবাবা ওদিনে ভাল খান।

মাকে বললাম—শীতকাল, মা পোলাও খাইনি অনেক দিন।

—পোলাও খাবি, বেশ তো কালই করে দিচ্ছি—পদকেও বল!

—হ্যাঁ মাসিমা, পদও বললো—পরশু আমি দাদার কাছে জামসেদপুর যাবো। স্কুলের মাইনে, নতুন বই কেনার জন্য টাকা-কড়ি তো আনতে হবে। দাদা কিছু পাঠায় নি। কালই হয়ে যাক পোলাওটা!

—আচ্ছা কালই হবে।—মা বললেন।

আমাদের বাড়ীটা বাগানপুকুর সমেত অনেকখানি জমির উপর। তার কোন কোণায় একটা আমগাছতলায় আমরা কি করি কেউ খবর রাখে না। রাখবার দরকার মনে করে না। এর মধ্যে ঐ জাম-গাছটার কোটরে কোনোদিন একটা কমলালেবু, কোনদিন দু-একটা টোপা কুল, কোনোদিন বা চাল-ছোলা ভাজা আমরা পেয়েছি। ভূতবাবার দান মনে করে খেয়েছি। আমিও একদিন পদ্মনাভর বাড়ী গিয়েছিলাম। ওরা মা আর ছেলে থাকে। বড় ছেলে চাকরি করে জামসেদপুর। খুব দুস্থ পরিবার। আমার মা বলেছিলেন, পদ নাকি দু'একদিন চাল চেয়ে নিয়ে গেছে মার কাছে। মা আরো বলেছেন, পদ খেতে পায় না, ওরা বড্ড গরীব। ভাল খেতে পেলে ও শরীর আরো ভাল হতো।

পরদিন পোলাও হলো। পদ আর আমি যথারীতি ভোগও দিয়ে এলাম। ভোগের প্রসাদটা পদ রেখেছিল, বললো বাড়ী নিয়ে যাবে। বেশ খেল পদ মার কাছে। খেতে খেতে বললো—দাদার কিছু মাইনে বেড়েছে কোয়ার্টার পেয়েছে। দেখে আসি জায়গাটা।

পদ যাবার সময় বলে গেল, আগামী ফাল্গুন মাসের শিবরাত্রির দিনও যদি ভূতবাবা না আসেন তো ঐ ভাঁড়টা তুলতে হবে। ওতে তাঁর আদেশ থাকবে বুঝলি। সেই মত কাজ করতে হবে।

—হুঁ!—বললাম আমি!

স্কুল খুললো পড়াশুনো আরম্ভ হলো। পদ এলো না। খবর

নিয়ে জানলাম ওরা মা ছেলে দুজনেই চলে গেছে জামসেদপুর। পদ্ম সেখানেই পড়বে। দুঃখ হলো কিন্তু কি করা যায়।

ফাল্গুন মাসের শিবরাত্রি। মা শিবরাত্রি করেন। রাত্রির চার প্রহরে চারবার পূজো করেন। বাড়ীর অনেকেই জেগে থাকেন। তাই আমার রাত জাগাতে কোন অসুবিধে হলো না। কৈ সারারাত জেগে থাকলাম, ভূতবাবা বকরাজ তো এলেন না।

পরদিন সকালেই ভূতবাবার আদেশ জানাবার জন্য ভাঁড়টা তুললাম। সবই ঠিক আছে তবে ভিজে গেছে কাগজটা, ওটাতেই আদেশ থাকবে। ভাঁজ খুলে দেখলুম, কাগজটিতে পেনসিল দিয়ে আঁকা একটা গাছের ডালে একটা দাঁড়কাক। তলায় জল, তার কিনারে বসে একটা বক দাঁড়কাকের নীচে লেখা 'কাকরাজ'— পদ্মনাভ, আর বকের গায়ে লেখা 'আহাম্বক—তারণ।'........

এ বিশ বছর পরে আসানসোল রেলস্টেশনের ওয়েটিং রুমে দেখি পদ্মনাভ খবরের কাগজ পড়ছে। ওকে দেখেই বলে উঠলাম —কাকরাজ?

ওর বড় বড় চোখ দুটো তুলে এক সেকেণ্ড আমাকে দেখে বললো,—কিরে আহাম্বক! কেমন আছিস?

———

পরোপকার পরম ধর্ম

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

পরের উপকার করা কর্তার একটা বাতিক। মাঝে মাঝে পরোপকার করতে না পারলে কর্তার মনে হয়, জীবনের কটা দিন বৃথা গেল। হঠাৎ একটা পরোপকার করে দেখাতে পারলে বেশ কিছু দিন তাঁর সুখে এবং শান্তিতে যায়। সব সময় তিনি পরোপকারের ধান্ধায় ঘোরেন। সুযোগ একবার এসে গেলে, সে যতটুকু সুযোগই হোক ছেড়ে দেন না। পাত্র-অপাত্র কোনো বাদ-বিচার নেই। যাকে হাতের কাছে পান তারই উপকার করতে কর্তা সদা প্রস্তুত। লোকে বলে, অহিংসা পরমো ধর্মঃ, কর্তা বলেন—'পরোপকার পরম ধর্ম।'

গরু হারিয়েছিল একজনের। পাড়াতে থাকত সে। মুখ শুকিয়ে ঘুরছিল রাস্তায়। কর্তা চিনতেন না লোকটাকে, কিন্তু তার শুকনো মুখ আর হাতে দড়ি আর খুঁটি দেখেই ঠিক চিনেছেন যে এর গরু হারিয়েছে। সব কাজ পড়ে রইল, ভিড়ে পড়লেন তার সঙ্গে গরু খুঁজতে। কিন্তু হারানো গরু কি আর অত সহজে পাওয়া যায়? কার ক্ষেতে হয়তো ঢুকে গাছ নষ্ট করছিল, সে বেঁধে রেখে দিয়েছে। কর্তার বয়স হয়েছে। তার উপর লোকটাকে সঙ্গে জুটিয়েছেন। খানিকক্ষণ ঘুরে হাঁপিয়ে পড়লেন। তখন বললেন তাকে—ওহে শুনছ, তোমার যখন গরু হারিয়েছে, তোমায় আমি একটা গরু দান করতে চাই। তুমি ব্রাহ্মণ তো?

ব্রাহ্মণকে গোদান করলে পুণ্যি হয়, কর্তা জানতেন, একসঙ্গে

পরোপকার এবং পুণ্যের সুযোগ ছাড়বেন কেন ?

লোকটা জিভ কেটে বললে—আজ্ঞে না, আমি সদগোপ।

কর্তা বললেন তা হোক, ও একই কথা। তুমি আমার বাড়ি এস, গরুর ব্যবস্থা করছি। আর ঘুরতে পারি না ?

তাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে কর্তা গরু কেনার টাকাও দিলেন, আর সে-ও তার ঘরে ফেরার পথে হারানো গরু খুঁজে পেল।

কর্তা অবশ্য তাঁর টাকা ফেরত নিলেন না। সদ্‌গোপটির একটার জায়গায় ছুটো গরু হল। এই কর্তার পরোপকারের জ্বলন্ত উদাহরণ।

তারপর আর একটা ঘটনা বলি।

শশীবাবু রোজ সন্ধ্যায় কর্তার আসরে আসতেন, সেদিনই আসেন নি।

কর্তা বললেন, কি হে, শশীবাবুকে দেখছিনে আজ ? আজ আমাদের পেঁয়াজ-ফুলুরির দিন। জেনে শুনেও শশী এল না ? হয়েছে কি ?

কর্তার আসরে আজ চায়ের সঙ্গে মুড়ি আর পেঁয়াজ-ফুলুরি দেওয়া হবে জেনেও শশীবাবু এলেন না, এটা খুবই আশ্চর্য। অসুখ-বিসুখ করেনি তো ?

নন্দবাবু জানতেন আসলে কি ঘটেছে। তিনি বললেন—আজ্ঞে না, সে অন্য ব্যাপার।

—কি ব্যাপার খুলেই বল।

—আজ্ঞে শশীবাবুর বড় ছেলেটা আজকাল বেজায় লেখাপড়া ফাঁকি দিতে শিখেছে। পাড়ার বদ ছেলেদের সঙ্গে সারা দিন আড্ডা আর গুলি খেলা। শশীবাবু হদ্দ হয়ে গেছেন। এবারে ছেলে ক্লাস প্রমোশন পেল না। নীচের ক্লাসেই এক বছর ধরে থাকতে হবে। মনের ছুঃখে শশীবাবু ছেলেকে ধরে খুব পিটেছেন কিন্তু পিটলে তো আর ছেলে পাশ করবে না, তাই শশীবাবুর মনের ছুঃখে যেমনকে তেমনি রয়ে গেছেন। শশীবাবুর বড় ভরসা ঐ বড় ছেলের উপর।

ছেলে-পিলেরই তো বড় হয়ে মানুষ হয়ে বাপ-মাকে দেখবে। আপনিই বলুন কর্তা ? সেই কারণেই শশীবাবু র আজ মন বড় ভার, বাড়ি থেকে বেরন নি।

কর্তা বললেন—বল কি, এ তো শশীর মস্ত সমস্যা। মন খারাপ তো হবেই। বলে গুম হয়ে খানিকক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর বললেন —কাল সকালেই আমি শশীর বাড়ী যাব। কিছু একটা করা দরকার।

পরদিন সকালে কর্তা কি ভেবে শশীবাবুর বাড়ি আর গেলেন না। নন্দবাবুর কাছ থেকে জেনে নিলেন শশীবাবুর ছেলের ইস্কুল কোথায়। সেই স্কুলে গিয়ে হেডমাষ্টার মশাই-এর সঙ্গে দেখা করলেন। তারপর হেড মাষ্টারমশাইকে বিশদভাবে বোঝালেন—এই বলে ছেলে-পুলেরা, বুঝলেন হেড মাষ্টারমশাই, শরৎকালের আকাশের মতো এই মেঘ বৃষ্টি আবার এই রোদ। কখনও হাসে কখনও কাঁদে। এই দেখছেন ভালো মানুষটি, তারপরই দুষ্টুর সেরা। শশীর ছেলে যে ফেল করেছে তার মানে এ নয় যে সে চিরকাল খারাপ। কটাদিন দুষ্টুমি করেছে, পড়ায় ফাঁকি দিয়েছে, দেখবেন আবার ও ভালো হয়ে যাবে, আবার পাশ কববে।

কর্তা—হেন গণ্যমান্য লোক এইভাবে একটা নগণ্য ছোট ছেলে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন দেখে হেড মাস্টারমশাই হতচকিত হয়ে উঠলেন। তিনি কি করবেন ভেবে পেলেন না। শুধু বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, এক বছর নীচের ক্লাসে থাকলেই লজ্জায়ই ওর পড়াশোনায় মন বসে যাবে।

হেড মাস্টারমশায়ের এই কথায় কর্তা আসলে যা বলতে এসেছিলেন, তা তাঁর গুলিয়ে গেল। তিনি থতমত খেয়ে বললেন—তা তো যাবেই। তা তো যাবেই।

তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ। হেড মাষ্টারমশাই আঁচ করবার চেষ্টা করলেন, কর্তার মনের কথাটা কি ? কিন্তু ধরতে পারলেন না। শেষে তিনি সোজাসুজিই জিজ্ঞাসা করলেন—ছেলেটির সম্বন্ধে

আপনার আর কিছু প্রস্তাব আছে নাকি ?

কর্তা বললেন—দেখুন, আমি ছেলেটির একটু উপকার করতে চাই। আপনি যা বলেছেন, তাতে করে আসলে শাস্তি হচ্ছে। উপকার যে কবে হবে তার ঠিক নেই। আমি বলছিলুম কি, আমি ভার নিচ্ছি ওর। এবারকার মত ওকে পাশ করিয়ে দিন। সামনের বারে পরীক্ষায় ওকে ঠিক তরিয়ে দেব।

ব্যস্, হয়ে গেল। শশীবাবুর ছেলে পাশ করে গেল! শশীবাবু আবার কর্তার আসরে আসতে আরম্ভ করলেন। আর কর্তা শুরু করে দিলেন গাধা পিটিয়ে ঘোড়া তৈরী করা।

ছেলেটা গুলি খেলা ছেড়ে দিল। পরের বারে সত্যি সত্যি ভালভাবে পাশ করে গেল। এই নিয়ে কর্তার আর আনন্দের সীমা নেই।

একবার কর্তার হাত ফস্কে মস্ত একটা বড় পরোপকার পালিয়ে যায়। মুখে প্রকাশ করেননি যদিও, কিন্তু মনে মনে কর্তা সেবার ভারী দুঃখ পেয়েছিলেন। কর্তা ছিলেন পণ-প্রথার বিরুদ্ধে। বলতেন, ওটা আমাদের সমাজের একটা জঘন্য প্রথা। সেই কর্তার আসরের বংশীবাবু শোনা গেল ছেলের বিয়ে দিয়ে মেয়ের বাপের কাছ থেকে তিন হাজার টাকা পণ আদায় করছেন। শুনে কর্তা রেগে আগুন। বললেন—এ অনাচার বন্ধ করতেই হবে। ছুটলেন কন্যাগৃহে। বুড়ো বাপ অন্নদাবাবুকে বললেন—খবরদার, আপনি এ পণ দেবেন না।

অন্নদাবাবু বললেন—তবে আমার মেয়ের বিয়ে হয় কি করে।

কর্তা বললেন-পণ না দিয়েই বিয়ে হবে। আমি দেখছি। বলে ছুটলেন বংশীবাবুর বাড়ি। বংশীবাবুকে এই মারেন তো এই মারেন। খুব বকুনি দিয়ে শেষে বললেন-তুমি যদি এমন অনাচারের প্রশ্রয় দাও তাহলে তোমার আমি মুখ দর্শন করব না।

বংশীবাবু চুপ করে সব শুনলেন তারপর কর্তার সামনে এক গ্লাস ঠাণ্ডা সরবৎ এগিয়ে দিয়ে বললেন—তবে শুনুন কর্তা, আমার কথাটা

আমার ছেলের বিয়ে দিয়ে অন্নদাবাবুর কাছ থেকে তিন হাজার টাকা পণ আদায় করেছি এ কথা সত্যি। তারপর দেখুন, আমার মেয়ে বীণা-মার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে জগবন্ধুবাবুর ছেলের সঙ্গে জগবন্ধুবাবু আমার কাছ হতে তিন হাজার টাকা আদায় করছেন।

কর্তা লাফিয়ে উঠে বললেন—অ্যাঁ, বল কি ? তোমার উপর এই অত্যাচার ? এ বন্ধ করতেই হবে।

বংশীবাবু বললেন—শুনুন। আমার সঙ্গে আগে কথা শেষ করতে দিন। জগবন্ধুবাবু তো আমার কাছ থেকে পণ পাবেন। এদিকে জগবন্ধুবাবুর মেয়ে আশা বড় হয়েছে তার বিয়ের কথাবার্তা চলছে—নরেশ হাজরার ছেলের সঙ্গে। নরেশ হাজরা পণ চাইছেন তিন হাজার টাকা। তারপর দেখুন নরেশ হাজরারও তো মেয়ে আছে। বছর তুইয়ের মধ্যে তারও বিয়ে দিতে হবে। নরেশবাবু চেষ্টা করছেন অন্নদাবাবুর ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ করার। এ ক্ষেত্রে অন্নদাবাবু নিশ্চয়ই তিন হাজার টাকা পণ চাইবেন। তাহলে হিসেব করে দেখুন কর্তা কার লাভ হচ্ছে, কারই বা লোকসান। আপনি যে পরোপকার করতে চেয়েছেন, আগে ঠিক করুন কার উপকার করবেন ?

কর্তার গর্ব ছিল, তিনি অঙ্কটা বেশ ভালো জানেন। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে মনে মনে অঙ্কের হিসাব করবার চেষ্টা করলেন। অন্নদাবাবু নরেশবাবু, বংশীবাবু, জগবন্ধুবাবু এতগুলি নাম আর তিন তিন হাজার টাকার দেনা-পাওনা একসঙ্গে মাথার মধ্যে ঢুকে জট পাকিয়ে গেল। সরবতের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন যা গরম পড়েছে, মাথাটা ঠিক খেলছে না। বল তো বংশী, কার লোকসান হচ্ছে ? চেষ্টা করে দেখব যদি তাকে কিছু পুষিয়ে দিতে পারি।

বংশীবাবু হেসে ফেলে বললেন—এটাও বুঝলেন না কর্তা, কতগুলো তিন হাজার হাত বদলা-বদলি করলো, সবগুলোই শেষাশেষি কেটে গেল। কারুরই লোকসান নেই। পণপ্রথাকে আপনি গালাগালি করেন, কিন্তু বার করুন এর খুঁৎ।

কর্তা খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে আর তাঁর পরোপকার প্রবৃত্তিতে বাধা দেওয়ায় বংশীবাবুর উপর খানিকটা চটে বাড়ি ফিরে এলেন।

বংশীবাবুর ছেলের বিয়ে নির্বিঘ্নে চুকে গেল।

এর পরের ঘটনায় কর্তার পরোপকার প্রবৃত্তি যে চোট খেলো তা কাটিয়ে তিনি উঠতে পেরেছেন কিনা এখনও জানা যায়নি। একদিন কর্তার সকালের আসর ভেঙ্গেছে, বন্ধুরা যে যার বাড়ীর দিকে রওনা হয়েছেন, কর্তা স্নানের জন্যে তেল মাখতে যাবেন বলে উঠি উঠি করছেন সেই সময় একজন অচেনা লোক কাঁচুমাচু মুখে তার বৈঠকখানা ঘরে ঢুকলেন। একটু কাছে আসতে কর্তা দেখলেন তার বুকপকেটটা ছেঁড়া। ছেঁড়া পকেটটা খাতার পাতার মতন লটপট করছে।

কর্তা তাঁর দিকে উৎসুক নেত্রে তাকিয়ে আছেন দেখে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন—হুজুর এই অবেলায় এসে আপনাকে বিরক্ত করছি বলে ক্ষমা চাইছি। কিন্তু আমার সর্বনাশ হয়ে গেল।

কর্তা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—কি হল আপনার?

ভদ্রলোক বলতে শুরু করলেন—আমি আজ সতের বছর দত্ত-পুকুরের দত্তদের বাড়ি গৃহ-শিক্ষকতা করছি, কিন্তু এমন বিপদে কোনদিন পড়িনি।

কর্তা সোজা হয়ে বসে বললেন—বলেন কি? বলুন তবে বিষদভাবে, শুনি।

ভদ্রলোক বললেন—দত্তবাড়ি থেকে আজ মাইনে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলুম। দত্তবাবুদের অনুরোধ করেছিলুম তিনমাসের মাইনে অগ্রিম দিতে। একটা বাড়ি করাচ্ছি তার ছাদ ঢালাই করা দরকার তাই টাকার প্রয়োজন। দত্তবাবুরা দিয়েছিলেন। অনেকগুলো নোট—বুকপকেটটা উঁচু হয়েছিল, তাই বাঁ হাতে করে পকেটটা চেপেই রাস্তা দিয়ে চলেছিলুম। আপনাদের পাড়ায় এসেছিলুম একটা ওষুধের খোঁজে। এখানকার এক ডাক্তারখানায় ডাক্তারের উপর

আমার খুব অসীম বিশ্বাস। বহুদিনের পুরনো পেটের ব্যথা যখন খুব বেড়ে ওঠে, ঐ ডাক্তারের এক শিশি ওষুধ খেলেই কমে যায়। ওষুধ নিয়ে ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে হনহন করে বাড়ির পথে আপনাদের ঐ বুড়ো বটতলায় যেই না এসেছি, অমনি পিছন থেকে একজন মারল ধাক্কা। আমি ছিটকে মুখ থুবড়ে পড়ি আর কি, বুক-পকেট থেকে তখন হাত সরে গেছে, সেই সময় কে একজন—আহা-হা পড়ে গেলেন? বলে পিছন থেকে আমায় জাপটে ধরল। আমি আর পড়লুম না বটে, পিছনের লোকটি আমায় বাঁচিয়ে দিল, কিন্তু সামলে নিয়েই দেখলুম আমার পকেট খালি, ডানহাতের ওষুধের শিশিটাও নেই। চকিতে পিছন ফিরে আমি সেই লোকটাকে ধরে ফেললুম। ফিনফিনে পাঞ্জাবী পরা ভদ্রলোক। চোর বলে মনে হয় না। তাহলেও চোখ পাকিয়ে তাকে বললুম—আপনি আমার পকেট মেরেছেন, শিগ্‌গির বার করুন টাকা। ভদ্রলোক আকাশ থেকে পড়লেন, বললেন—হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন, বাঁচালুম আপনাকে, আবার বলেন পকেট মেরেছি? লোকজন জড় হচ্ছিল ততক্ষণে। সকলের সামনে আমি ভদ্রলোককে সাচ করলুম। একটি নোটও পেলুম না। মহা অপ্রস্তুত। বুঝলুম টাকাটা চোখের পলকে পাচার করে দিয়েছে। ওষুধের শিশিটা পর্যন্ত। বোকা বনে গেলুম কর্তা। কি করব, ছেড়ে দিলুম লোকটাকে। তারপর নিঃস্ব হয়ে আপনার দ্বারে এসেছি।

বলে ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন।

কর্তা বললেন—আমার পাড়ায় চুরি যখন হয়েছে আমি এর বিহিত করছি। আপনি পাশের ঘরে গিয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসুন। যতক্ষণ না ডাকি এ ঘরে আসবেন না।

বলে ভদ্রলোককে পাশের ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। চাকরদের বললেন—বাবুকে অমৃতি আর ডাবের জল দে।

কর্তার পাড়ায় বুড়ো বটতলার কাছেই ছিল পুরণ গুণ্ডার আড্ডা।

কর্তা সকলেরই পরোপকার করেন, পুরণ গুণ্ডারাও একবার করেছিলেন। পুরণের চোরাই কোকেনের ব্যবসা। সন্ধান মুলুক পুলিশের দল একবার ভোর রাত্রে পুরণের আড্ডায় হানা দিয়েছিল। পুলিশ আসছে খবর পেয়েই পুরণ তার কোকেনের থলি সমেত কর্তার বাড়ি এসে কর্তার পায়ের কাছে দড়াম করে আছাড় খেয়ে পড়েছিল। কর্তা ভোরে তাঁর বেলফুলের ঝাড়গুলি থেকে আগের রাতের ফোটা বেলফুল তুলে তুলে হাতের মুঠোয় জমা করেছিলেন। সেই সময় সাক্ষাৎ পুরণ গুণ্ডার প্রবেশ।

পুরণ হাত জোড় করে বললেন—হুজুর বাঁচান।

দুঃস্থ এসে আশ্রয় চাইছে। কর্তার পরোপকার প্রবৃত্তি জেগে উঠল। পুরণকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে তার থলিসুদ্ধ তাকে তক্তাপোষের তলায় লুকিয়ে রেখে দিলেন। পুলিশ এসে কাউকে না পেয়ে চলে গেল।

এই পুরণ গুণ্ডাকে কর্তা ডেকে পাঠালেন। পুরণ শুনে বললেন—বুড়ো বটতলায় যদি রাহাজানি হয়ে থাকে তবে আমার জানপছন-লোক। কিছু ভাববেন না, এনে দিচ্ছি। এই বলে কিছুক্ষণের মধ্যেই গৃহশিক্ষকের তিনশ' পনের টাকা আর খালি ওষুধের শিশিটা ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

কর্তা বললেন—ওষুধ কি হল?

একটা লোক জ্বরে কাঁপছিল তাকে খাইয়ে দিয়েছে।

কর্তা আঁৎকে উঠে বললেন—সে কি? ও যে পেটের অসুখের ওষুধ। জ্বরের রুগীকে খাইয়ে দিলে?

—আমরা হুজুর গরীব মানুষ, আমাদের একটা ষষুধ হলেই হল। ঠিক সেরে যাবে।

—তাই বলে পুরো এক শিশি ওষুধ খাইয়ে দিলে, বোধহয় দু'দিনের ডোজ।

—হুজুর, জ্বরটা একটু বেশি হয়েছিল ভাল ফলই হবে।

জ্বর কেন, মানুষসুদ্ধ একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাক। তাই বলে আর কথা না বাড়িয়ে কর্তা পুরণকে বিদায় দিলেন। তারপর খালি ওষুধের শিশি আর টাকা নিয়ে ঢুকলেন পাশের ঘরে।

গৃহশিক্ষকের মুখে হাসি ধরে না। ওষুধটা নেই বলে কর্তা দুঃখ করতে লাগলেন। গৃহশিক্ষক বললেন—যা হয়ে গেছে তার তো আর চারা নেই। বলে কর্তার পায়ের ধুলো বার বার নিয়ে—বেলা বেড়ে গেল কর্তা এবার স্নান করুন - বলতে বলতে বিদায় হলেন।

কর্তার সেদিন আর টুলে বসে ডলাই মলাই করে তেল মাখবার সময় ছিল না। মাথায় এক খাবলা তেল মেখে স্নানের ঘরে ঢুকতে যাবেন, এমন সময় পুরণ গুণ্ডার পুনঃপ্রবেশ।

—কি পুরণ? আবার কি মনে করে?

—হুজুর, দত্তবাড়ির মাস্টারকে কি তার টাকা ফেরৎ দিয়েছেন?

—হ্যাঁ এই মাত্তর তো দিয়ে দিলুম। শুধু ওষুধটা দিতে পারলাম না।

—তবে তাজ্জব ব্যাপার হুজুর। বুড়ো বটতলায় গিয়ে দেখে এলুম একজন বসে বসে কাঁদছে। তাকে দেখে তো দত্ত বাড়ির মাস্টার বলেই মনে হয়। পকেট কিন্তু তার খালি।

—বলিস কিরে? আবার পকেট মারা গেল নাকি? চল তো দেখে আসি। বলে স্নান মাথায় উঠল, খড়ম পায়ে দিয়ে কর্তা ছুটলেন বুড়ো বটতলায়।

সেখানে সত্যিই একজন লোক বসে কাঁদছিলেন। তার চেহারা কিন্তু কর্তা যাঁকে দত্তবাড়ির গৃহশিক্ষক বলে চিনেছিলেন তাঁর মত মোটেই নয়।

খোঁজ-খবর করে সহজেই জানা গেল ইনিই দত্তবাড়ির সত্যি-কারের গৃহশিক্ষক। এরই পকেট মারা গিয়েছে। তিনমাসের মাইনে তিনশ' পনের টাকা আর এক শিশি পেটের ওষুধ লোপাট। নকল গৃহশিক্ষকের কোথাও চিহ্ন নেই।

কর্তাকে আরো একবার পরোপকার করতে হল। প্রথমেই পাশের ডাক্তারখানা থেকে ভদ্রলোকের এক শিশি পেট ব্যাথার ওষুধ কিনে দিলেন। টাকার শোকে ভদ্রলোকের পেটের ব্যথা বেড়ে উঠেছিল। টাকার শোকে যত না কাঁদছিলেন পেটের ব্যথায় কাঁদছিলেন তার চেয়েও বেশী। ওষুধ খাইয়ে শিক্ষক মহাশয়কে ঠাণ্ডা করে কর্তা বৈঠকখানায় নিয়ে এলেন। তারপর তিনশ' টাকা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বললেন—আমার এই সামান্য উপহারটুকু দয়া করে গ্রহণ করুন।

ভদ্রলোক একটু ইতস্ততঃ করে শেষ অবধি গ্রহণ করলেন টাকাটা। কর্তা তখন জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, বলুন তো বুক-পকেট থেকে টাকা মেরে দিতে গেলে পকেটটা না ছিঁড়লেও কি চলে?

ভদ্রলোক বললেন—তা তো বটেই। এমন হাত সাফাই ওদের জানতেই পারবেন না। আমার পকেট যেমনকে তেমনি আছে। সেলাইয়ের একটা সুতো পর্যন্ত সরেনি। কিন্তু কেন জিজ্ঞেস করছেন এ কথা হুজুর?

কর্তা বললেন -সে কিছু নয়। আপনি আজ বাড়ি যান। বলে ভদ্রলোককে বিদায় দিলেন।

কর্তার একটা পরোপকার আজ হল বটে, কিন্তু অন্য পরোপকার করতে গিয়ে যে বেদম ঠকে গেলেন সেটা ভুলতে পারছিলেন না। তেলা মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালতে ঢালতে কেবলই বলতে থাকলেন—ইস্, ছেঁড়া পকেটটা দেখেই আমার বোঝা উচিত ছিল যে লোকটা ঠগ্।

———

দাদুর দ্বিতীয় ইঁদুর

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

মাঝরাতে দাদু একবার বাথরুমে গিয়েছিলেন। প্যানে যতটুকু জল জমে থাকে, সেই জলে তিনি যেন সরু একটা মুখ দেখতে পেলেন। জিনিসটা কী, ঘুম-চোখে ঠিক বুঝতেও পারছেন না। চোখে চশমা নেই যে, ভাল করে দেখবেন। চশমা ছাড়া আজকাল কাছের জিনিস আর দেখাই যায় না। পুরো শরীরটা দেখা যাচ্ছে না। মুখটাই কেবল উঁচিয়ে আছে জলের ওপর। আপ্রাণ চেষ্টা করছে জল ছেড়ে উঠে আসার।

দাদু ভাবলেন, কী রে বাবা। জগদানন্দের বালিগঞ্জের বাড়িতে দোতালার বাথরুমের প্যান থেকে গোখরো সাপ ফোঁস করে উঠেছিল। জগদানন্দ ভিতু মানুষ। ভয়ে শাওয়ারের ডাণ্ডা ধরে পাকা পনেরো মিনিট ঝুলে ছিল। অবশ্য জগদানন্দ মনে করেছিল ঝুলে আছে। আসলে কিন্তু তা নয়। মাটিতেই তার পা দুটো ছিল। দেহের ভারে পাইপ বেঁকে ধনুকের মতো নীচে নেমে এসেছিল। সাপ বিশেষ করে গোখরোর মতো রাজা-সাপ ভিতুদের ছোবল মারে না। একপাশে গোল হয়ে বসে জগদানন্দের নিশ্বাসের ফোঁসফোঁসানি শুনছিল। সাপ যেন কী একটা পারে না। হয় শুনতে, না হয় দেখতে। সে যাই হোক, জগদানন্দকে বাথরুম থেকে কিছুতেই বেরোতে না দেখে সকলের সন্দেহ হল, হার্ট অ্যাটাক নয় তো? বেশীর ভাগ হার্ট অ্যাটাকই বাথরুমে হয়। দরজাও ভাঙা যাচ্ছে না। জগদানন্দ বাঁকা পাইপ ধরে দরজা ব্লক করে বসে

আছে। বাইরে চেঁচামিচি শুনে অতি কষ্টে বললে, "বেচে আছি। কতক্ষণ থাকব জানি না। সাপ।" বাইরে থেকে সাহসীরা বললে, "সাপ তো কী হয়েছে বেরিয়ে আসুন।" জগদানন্দ বেরুবে কী করে? বেরোবার পথ তো নিজেই বন্ধ করে বসে আছে। বাথ-রুমের কোণ থেকে দরজার মাথার ওপর দিয়ে শাওয়ারের পাইপ ছিল। সেই পাইপ এখন বেঁকে নীচে নেমে এসেছে। দরজা কোনও রকমে একটু খুলতে পারে। সে ফাঁক দিয়ে ভুঁড়ি গলবে না।

সেই জগদানন্দ আর বাথরুমে সাপের কথা ভেবে দাদু প্রথমটায় খুব ভয় পেয়েছিলেন। তারপর ওকালতি বুদ্ধি খেলিয়ে বুঝতে পারলেন ওটা সাপ নয়। সাপের সরু সরু গোঁফ থাকে না। তাহলে কী? সেপটিক ট্যাঙ্কে পোকা হয়। লাখ লাখ পোকা। সেই পোকা নয় তো? সর্বনাশ! লাখে লাখে সেই পোকা তেড়ে-মেরে বেরিয়ে আসতে চাইছে নাকি? আঁতকে উঠলেন। আর একবার ভাল করে ঝুঁকে দেখতেই মনে হল, চিনি গো চিনি, তুমি নেঙটি ইঁদুর। ভিজে বেড়ালের মতো চেহারা হয়েছে মানিক। মরতে ওখানে গিয়ে পড়লে কী করে? বেশ তো ছিলে আমার বইয়ের র‍্যাকে। যেখানে গিয়ে পড়েছ, সেখান থেকে তো আর উঠতে হবে না।

দাদু এক বালতি জল নিয়ে হুড় হুড় করে প্যানে ঢেলে দিলেন। চোখ বুজে প্রার্থনা করলেন, আমার মূল্যবান বইসমূহ কেটে কুঁচি কাটা করলেও ঈশ্বর এই নির্বোধ প্রাণীর আত্মার সদ্‌গতি করে দাও। আসচে বার ও যেন পণ্ডিত হয়ে জন্মায়। বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দাদু বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন।

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এ আমি কী করে ফেলপুম? আমার কী দরকার ছিল এক বালতি জল হুড় হুড় করে বাথরুমে ঢালার। পরোক্ষে আমিই হয়ে গেলুম ওই প্রাণীটির মৃত্যুর কারণ। একটা জীবন দিতে পারি না, একটা জীবন নিয়ে নিলুম। বিছানায় উঠে বসে আবার প্রার্থনা করলেন, "ঈশ্বর, এই নির্বোধ বৃদ্ধকে ক্ষমা

করো প্রভু! ঝোঁকের বশে জল ঢেলে ফেলেছি। ও-কি আর ওই গাড্ডা থেকে উঠতে পারত প্রভু? পারত না। তাই আমি জল দিয়ে ঢেইয়ে দিয়েছি। ওই অপবিত্র শরীরে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই কি ভাল নয়? আমি নিজে যদি কখনও ম্যানহোলে পড়ে যাই, কথা দিচ্ছি, আমি বাঁচতে চাইব না। দমকলের লোককে গর্ত থেকে হেঁকে বলব, হোস দিয়ে আমাকে পদ্মার পাড়ে পাঠিয়ে দও। সত্যি বলছি প্রভু। মিথ্যে নয়। তুমি আমাকে একবার ফেলেই দেখো।

এত করেও দাদু শান্তি পেলেন না। ইশ, জলটা না ঢাললেই হত। আবার উঠলেন। যথাক্রমে গিয়ে একবার দেখে আসি। মুখটা বেরিয়ে আছে না কি! বেরিয়ে থাকলে আর জল ঢালব না। ওর নিজের বরাতের ওপরেই ছেড়ে দোব। নাঃ, বরাত করিনি আমি। কোথায় কী? প্যানের গর্তে পরিষ্কার টলটলে জল। সেই ছুঁচলো মুখ অদৃশ্য। খুনের দায়েই পড়ত হল। মৃত্যুর পর ঈশ্বরের আদালতে বিচার হবে। এখানকার আদালতে আমি মানুষের বিচার করি। সেখানকার আদালতে আমার বিচার হবে। বেলিফ হেঁকে বলবে, আসামি হাজির।

বিষণ্ণ মনে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন। অনুশোচনায় ঘুম এসে গেল। নাক ডেকে উঠল ফুড়ুত ফুড়ুত। এদিকে তাকিয়ে যাওয়া ইঁদুর আবার ভেসে উঠল। প্রাণপণ চেষ্টা করে উঠে এল ওপরে। অদম্য ইচ্ছা-শক্তি, বাঁচতে আমাকে হবেই। বুড়োর লাইব্রেরিতে এখন হাজার খানেক বই। একেবারে টাটকা। দাঁত পড়েনি একবারও। ওই বইয়েরই একটা পাতায় লেখা আছে, আয়ু অল্প, বহু বিঘ্ন, অগাধ জ্ঞানভাণ্ডার, হাঁসের মতো জল থেকে দুধটুকু টেনে নিতে হবে। আমি ইঁদুর। আমার আয়ু ওদের চেয়ে আরো কম। আমার শত্রু অনেক। বেড়াল, কাক, পেঁচা, সাপ, ইঁদুর কল। ক'টা ইঁদুর আর স্বাভাবিকভাবে মরে! সবাই তো অপঘাতে শেষ হয়ে

যায়। এই তো আমিই ! এখুনি মরতে মরতে বেঁচে এলুম আমাদের ভগবানের জোরে।

ইঁদুরটা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সেই রাত বারোটা থেকে ক্রমান্বয়ে সাঁতার কেটে চলেছে। এখন প্রায় তিনটে। মানুষ হলে 'রেকর্ড করেছি, রেকর্ড করেছি' বলে গলায় পদক-টদক ঝুলিয়ে বসে থাকত। মরতে মরতে বেঁচে ফিরে আসার অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী লিখে ফেলত। সিনেমা হত। হীরো বনে যেত। ইঁদুরের সংবাদ-পত্রও নেই, সাংবাদিকও নেই। একমাত্র উল্লেখ আছে সেই কবির লেখায়ঃ উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার।

ইঁদুরও ক্লান্ত হয়, ইঁদুরেরও ঘুম পায়। এখন একটু বিশ্রাম দরকার ভেবে বাথরুমের ভেতরই ইঁদুরটা একটা শান্তির জায়গা খুঁজতে লাগল। ইঁদুর বলে কি মানুষ নয়? দাদু যে বালতি থেকে জল ঢেলেছিলেন, কলের তলায় সেই বালতিটা ইতিমধ্যে শুকিয়ে এসেছে। মানুষেরই মাথামোটা হয়, ইঁদুর বুদ্ধিমান হলেও কোনও কোনও ইঁদুর বেশ গবেট। একগুঁয়ে। গণ্ডার না হয়ে ইঁদুর হলে যা হয়। এই ছুঁচোটাও সেই রকম। ভেজা ইঁদুরও লাফাত পারে। সেটা সহজেই বোঝা গেল। ইঁদুরটাও বুঝতে পারল। যখন তিড়িং করে লাফ মেরে ওই খালি বালতিটায় গিয়ে পড়ল। মুখ জানে না, বালতি বালতিই। বালতিটা খাট নয়। তার ওপর মাথার সামনেই কল। সেই কল আবার খোলা। খোলাই থাকে। ভোর ছ'টায় জল এলে কেউ উঠুক না উঠুক ভরে থাকবে। শিয়রে শমন রেখে মানুষ ঘুমোতে না পারলেও ইঁদুর ঘুমোতে পারে। 'বাঃ, কী সুন্দর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা প্লাস্টিকের বাড়ি' বলে ইঁদুরটা এক পাশে শুয়ে পড়ল। মাথার ওপর বাথরুমের গোল আকাশ। আহা। ইঁদুরটার তখনও একটা সন্দেহ ছিল, ভিজে ইঁদুর কিছু কাটতে পারে। তা না হলে আর একটু লাফিয়ে বেসিনে, উঠলে দাদুর পা পরিষ্কার করার স্পঞ্জটা পেত, একটা ছোবড়াও ছিল।

ইঁদুর ঘুমুলে মানুষের মতোই অসহায়। শেষ রাতে মানুষও গভীর ঘুমোয়, ইঁদুরও তাই। ছ'টার আগে ঘুম থেকে উঠলে ওই অবস্থা হত না। ঠিক ছ'টায় তেড়ে জল এল। ধোঁয়ার মতো। ইঁদুর নায়েগ্রাপ্রপাত দাঁতে কেটেছে হয়তো! তাতে তো ঠিক ধারণা হয় না জিনিসটা কী! পিরামিডও কাগজের মতো খেতে, নায়গ্রা-প্রপাতও কাগজের মতো। তফাত, কোনওটা আর্ট প্রিন্ট, কোনওটা হোয়াইট প্রিন্ট। এখন বুঝল, নায়গ্রা কাকে বলে মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। একেই বলে ক্লাউড বার্স্ট। ছ' লিটার বন্যা। বালতির মাপ ছ' লিটার। ছ' লিটার জলে আবার ইঁদুরের হাবুডুবু। যেখানে জল পড়ছে সেখানে ঘুর্ণি। সেই আকর্ষণে বালতির কানা থেকে থাবা ছেড়ে যাবার মতো হচ্ছে। পেছনের পা দিয়ে সাঁতার কাটছে। সামনের হাত দুটো দিয়ে বালতির কানা ধরে আছে। তোড়ে জল পড়ছে। ইঁদুরেরও মৃত্যুভয় আছে। কান দুটো পেছনে খাড়া। চোখ দুটো বেরিয়ে আসছে ঠেলে। চোঁচাঁ দৌড়লে মানুষের মুখ যে রকম সরু হয়ে যায়, এর মুখটাও তেমনি সরু দেখাচ্ছে।

সাড়ে ছ'টার সময় দাদু প্রথমে বাথরুমে ঢুকলেন। বেসিনে চোখ-মুখ ধুলেন। হাত দিয়ে অ্যা অ্যা করে জিভ ছুললেন। এই শব্দটা শুনলেই বুঝতে হবে প্রভাত হল। পাখি ডাকে। দাদু অ্যা অ্যা করেন। কলটা বন্ধ করতে গিয়ে দাদুর নজরে পড়ল। বালতিতে এটা কী রে? অ্যাঁ, সেই ইঁদুর। লোম-টোম ভিজে ছাল ছাড়ানো অবস্থা। আরে ছি ছি। তুই ব্যাটা প্যান থেকে উঠে এসে ফের বালতিতে পড়েছিস। তোর দেখছি নির্ঘাত জলে ডোবার ফাঁড়া আছে! একেই বলে মানুষের ভাগ্য। আমারও ওই রকম পতাকী যোগ ছিল। মাদুলি পরে বেঁচে আছি। তোর কোষ্ঠিও নেই। বাপ-মাও নেই। এতবড় এই বিরাট, বিপদসঙ্কুল পৃথিবীতে এইটুকু একটা শরীর নিয়ে বাঁচা যায়? তার ওপর অত্যাচারী। কেউ ভাল

চোখে যে দেখবে, সে-পথও রাখনি !

ইঁতুরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দাতুর মনে হল, সেই গল্পটা কত সত্যি। জলে ডোবা মানুষকে উদ্ধারের চেষ্টা না করে তীরে দাঁড়িয়ে তিরস্কার করা। উদ্ধারের কথা মনে হতেই দাতুর আবার ভীষণ ঘেন্না এসে গেল। ইশ, প্যান থেকে এসে মুখ ধোবার জলের বালতিতে পড়েছে। উত্তেজিত হলেই দাতুর ভাষা, ভাবনা সব হিন্দিতে চলে যায়। ইসকো হাটাও, আভি হাটাও, সব বাহারমে ফেক দেও। রামখেলোয়ান, রামখেলোয়ান।

দাতু বাথরুমের দরজা খুলে নটরাজের মতো নাচতে নাচতে বেরিয়ে এলেন। সামনেই রামখেলোয়ান। হাতে তোয়ালে। ভেবেছিল, বুড়াবাবু হয়তো তোয়ালে চাইছেন। দাতু বালতিটা দেখিয়ে বললেন, বিলকুল বাহার ফেকো।

দরজা পেরোলেই বাগান। দাতুর কথা শেষ হওয়া মাত্রই রামখেলোয়ান পালোয়ানি শরীর নিয়ে এক ঝটকায়. বালতিটা তুলে বাইরের বাগানে জলটা ফেলে দিল। পরিষ্কার তকতকে কচ্ছপের পিঠের মতো মাটি। চারপাশে জল গড়িয়ে গেল। রামখেলোয়ান জল ফেলে লাল বালতিটা করবী গাছের তলায় রাখতেই দাতুর খেয়াল হল, আরে বাইরে তো কাক আছে, ওই তো পাঁচিলে বসে ডাকছে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার, "কাঁহা ফেকা ?"

রাম বললে, "বাহারমে ফেকিয়ে দিয়েছি, যেমুন বলিয়েছেন।"

"আরে মুর্খ উসমে এক চুহা থা। কৌয়া লে যায়েগা। সর্বনাশ হো গিয়া।"

তু'জনেই উর্ধ্বশ্বাসে বাইরে ছুটলেন। রামখেলোয়ান বললে, "আপ য্যায়সা বোলা।"

দাতু খুব রেগে বললেন, "হাম মূর্খ হ্যায় তো তোম গোমূর্খ হোগা।"

পরিষ্কার মাটি। ঘাসটাস, ঝোপঝাপ কিছুই নেই। জল পড়ে

ভিজে ভিজে মাটি। ইঁদুরের চিহ্ন নেই। তিনটে কাক একটু আগে পাঁচিলে বসেছিল। কাক তিনটে আর নেই। দাদু হায় হায় করে উঠলেন। "তোর জন্যেই প্রাণীটা বেঁচেও বাঁচল না। জলে ডোবা থেকে যদিও বা বাঁচল, কাকে নিয়ে গেল। পাষণ্ড, আভি নিকালো। তোমকো হাম নেহি মাঙতা।"

রামখেলোয়ান মুখ কাঁচুমাচু করে বাইরের রকে গিয়ে বসে রইল। দাদু নিজেই বাগানটা তন্ন তন্ন করে খুঁজছিলেন। কোথাও নেই। আবার আমি। আমিই একটা প্রাণীর এতক্ষণের জীবন-সংগ্রাম শেষ করে দিলুম। আমি এক যমদূত। হে প্রভু, আমি যদি জলে ডুবি, তাহলে আমাকে কেউ যেন এইভাবেই তুলে বাঘের মুখে ফেলে দেয়। আমি তোমাকে স্ট্যাম্প-পেপারে লিখে দিয়ে যাব। আমার ওই সাজাই হওয়া উচিত।

দাদু উদ্‌ভ্রান্তের মতো বাগান থেকে বাড়ি ঢুকলেন। খুব মন খারাপ। পা ধুয়ে তোয়ালেতে পা মুছলেন। পাশেই বিদ্যাসাগরী চটি। প্রথমে বাঁ পা ঢোকালেন। তারপর ডান পা'টা ভাল করে মুছে জুতোতে ঢোকালেন। ডগার দিকে নরম-মতো কী একটা নড়ে উঠল। শুধু নড়লই না। চিঁক করে আওয়াজ করে উঠল। পা বের করে উলটে-পালটে পা'টাকেই ভাল করে দেখলেন। মানুষের পা তো চিঁকচিঁক করে ডাকে না। তবে কি জুতো ডাকছে? জুতোর সামনে থেবড়ে বসে পড়লেন। সেই ইঁদুর। জুতোর ভেতর ঢুকে গুটিসুটি মেরে বসে আছে।

রামখেলোয়ান, এই রামখেলোয়ান।" বাজখাঁই চিৎকার। একটু আগেই যার চাকরি গিয়েছিল, সে দৌড়ে এল। সারাদিনে বেচারার মিনিটে মিনিটে চাকরি যায়, আবার হয়। দাদুর নির্দেশে সে সাবধানে চটিটা তুলে নিল। দাদু বললেন, সামালকে, উসকা ভিতর সেই বীর চুহা হ্যায়। চলো।"

"কাঁহা চলে গা বড়া সাব।"

"তোমহারা ঘর।" বাইরের দিকে রামের ঘর, সেই ঘরে জুতো সুদ্ধু, ইঁদুর থাকবে। একদম ডিসটার্ব করা চলবে না। সন্ধের দিকে সুস্থ হয়ে নিজেই চলে আসবে দাদুর লাইব্রেরীতে।

সামনে রামখেলোয়ান চলেছে জুতো হাতে। ভেতরে ভিজে ইঁদুর। পেছনে দাদু চলেছেন পাহারাদার। বলা যায় না রাম যদি ফেলে দেয়। রাম বললে, "এ চিজ কাঁহাসে আয়া জি?"

দাদু গম্ভীর গলায় বললেন, "মুলুকসে।"

———

বীরবলের রসিকতা

স্মৃতা কর

সম্রাট আকবর রাজসভায় বসে রয়েছেন। চারদিকে মন্ত্রী, অমাত্য, সভাসদেরা ঘিরে রয়েছে। রাজসভার কাজ চলছে। হঠাৎ সম্রাট তাঁর পরিহাস রসিক সদস্য বীরবলের দিকে চেয়ে বলে, উঠলেন, "বীরবল, তুমি হলে আমার রাজসভার নবরত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রত্ন। শুধু তাই নয়, আমার প্রজারা বলে যে তোমার মত বুদ্ধিমান লোক দুনিয়ার কোথাও খুঁজে পাবে না। এই কথাটা সত্য তার প্রমাণ দাও। এমন একটা বুদ্ধির পরিচয় দাও যার ফলে প্রধান মন্ত্রী ও সভাসদেরা সবাই বোকা বনে যাবে, আমি বোকা বনে যাব।"

সম্রাটের কথা শুনে বীরবল দু-চার মিনিট চুপ করে বসে রইলেন। সেই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি মজার ফন্দী ভেবে নিলেন, তারপর বললেন—"সম্রাট, আপনি যা বলেছেন আমি তা করতে পারি, কিন্তু সেজন্য আমাকে লক্ষ টাকা দিতে হবে আর এক বছর সময় দিতে হবে।"

সম্রাট বললেন—"রাজকোষ থেকে যত ইচ্ছা টাকা নাও, এক বছর সময়ও নাও। তাছাড়া যা বলেছি তা করতে গিয়ে যদি দু' চারজন লোকের কোন ক্ষতি হয় বা কেউ অসন্তুষ্ট হয়, তাতেও তোমাকে কিছু বলব না।"

বীরবল সম্রাটকে অভিবাদন করে বললে—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন সম্রাট, আপনি যা চান তাই হবে।"

সেদিন রাজসভায় বীরবলের সঙ্গে এই রকম কথাবার্তা হল। সম্রাট আকবর কিন্তু হু'চার দিনের মধ্যেই নানাকাজের মধ্যে তাঁর কথাটা একেবারে ভুলে গেলেন।

কিছুদিন কেটে গেল।—হঠাৎ একদিন বীরবলের বাড়ী থেকে একজন লোক ছুটতে ছুটতে এসে সম্রাটকে জানাল যে বীরবলের খুব শক্ত অসুখ করেছে। রাজবৈদ্য বলেছেন বীরবলকে বাঁচান যাবে না, শীঘ্রই তিনি মারা যাবেন।

সম্রাট তাঁর অন্য সব মন্ত্রীর চেয়ে বীরবলকে বেশী ভালবাসতেন। এই খবর শুনে তাঁর মন এত খারাপ হল যে, রাজসভার কাজ বন্ধ করে দিলেন এবং কয়েকজন মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তখনি বীরবলকে দেখবার জন্য তাঁর বাড়ীতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন আপাদমস্তক সাদা চাদর ঢাকা দিয়ে বীরবলকে খাটিয়ায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। রাজবৈদ্য শুকনো মুখে পাশে বসে রয়েছেন। বীরবলের স্ত্রী আর ছেলেরা খাটিয়ার চারপাশ ঘিরে বসে 'হায় হায়' করে কপাল চাপড়ে কাঁদছে।

সম্রাটকে দেখে রাজবৈদ্য উঠে দাঁড়াল, অভিবাদন করে বলল— "সম্রাট বীরবল আর হু'চার মিনিটের মধ্যেই মারা যাবে। আপনি তার প্রিয় বন্ধু। তার আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করুন।

রাজবৈদ্যের কথা শুনে আর বীরবলের স্ত্রী-পুত্রের কান্না দেখে সম্রাটের চোখে জল এসে গেল। তিনি মন্ত্রীদের নিয়ে আল্লার কাছে প্রার্থনা করলেন, তারপর রাজবৈদ্যের নির্দেশ মত রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন। হু'ঘন্টা পরে সম্রাটের কাছে খবর পৌছল যে বীরবল মারা গেছেন।

সম্রাট আদেশ দিলেন তো হু'দিন ধরে তাঁর রাজ্যে বীরবলের জন্য শোকদিবস পালন করা হবে।

এর পর চার মাস কেটে গেছে। সম্রাট আকবর যথারীতি সভায়

বসে রাজকার্য করছেন এমন সময় একজন প্রতিহারী ছুটতে ছুটতে সভায় এসে ঢুকল। তার মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। ঠিক যেন ভূত দেখেছে এইভাবে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে কোন রকমে সম্রাটকে কুর্ণিশ করে সে বলল—"সম্রাট বীরবল...." এই বলেই তার মূর্ছা হল।

প্রতিহারীর কথা শুনে ও হাব-ভাব দেখে সম্রাট আকবর ও সভাসদেরা অবাক হয়ে গেলেন। কি হয়েছে কিছুই বুঝতে পারলেন না।

প্রধান মন্ত্রী বললেন—"লোকটার জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যতক্ষণ না এ সব কথা খুলে বলতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাপারটা কিছু বোঝা যাবে না।"

প্রধানমন্ত্রীর কথা সবেমাত্র শেষ হয়েছে এমন সময় হঠাৎ রাজসভার বাইরে ভীষণ হট্টগোল শোনা গেল। হাজার হাজার লোক একসঙ্গে চীৎকার করছে—"বীরবল বীরবল!"

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দামী রেশমী পোষাক পরে সুস্থ সবল দেহ নিয়ে বীরবল রাজসভার ঢুকে হাসিমুখে সম্রাটকে অভিবাদন করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। সম্রাট আকবর আর তাঁর মন্ত্রী ও সভাসদেরা হতভম্ব হয়ে বীরবলের মুখের দিকে চাইলেন। এ কি ব্যাপার, ভেবে উঠতেই পারলেন না। এমন আচম্বিতে ব্যাপার ঘটল যে ভয় পেতেও যেন তাঁরা ভুলে গেছেন।

বীরবল সম্রাটকে আবার কুর্ণিশ করে হাসিমুখে বললেন—"সম্রাট, ভয় পাবেন না। আমি ভূত নই। আপনার প্রিয় সদস্য বীরবল। তবে একথা ঠিক যে আমি যে চারমাস আগে মারা গিয়েছিলাম। মারা যাবার দু'মাস পরে আমি স্বর্গে গেলাম। সেখানে দু'মাস থাকলাম। স্বর্গে দেবরাজ আর দেবদূতদের চমৎকার চমৎকার গল্প শোনাতাম। দেবরাজ আর দেবদূতেরা বললে—এমন মজার গল্প তাঁদের কেউ কোনোদিন শোনাতে পারেনি।

খুব খুশি হয়ে তাঁরা আমাকে বর দিতে চাইলেন। আমি

বললাম—'আমি মর্ত্তে আমার বয়স্থ সম্রাট আকবরের কাছেই ফিরে যেতে চাই।' তাঁরা বললেন—'তথাস্তু।' কাজেই আজ স্বর্গ থেকে নেমে সোজা আপনার কাছে চলে এলাম।"

ব্যাপারটা যে আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং ব্যাপারটার মধ্যে যে কিছু আছে বুঝতে পেরে সম্রাট আকবর বীরবলকে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগলেন। কিন্তু চতুর বীরবল কৌশলে সে সব প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন। তিনি বললেন—"হে মহানুভব সম্রাট, আমি স্বর্গ থেকে আসবার সময় স্বর্গের এক রাণীকে সঙ্গে করে এনেছি। অপূর্ব সুন্দরী তিনি। তাঁকে আমি এক গভীর বনে রেখে এসেছি। শিগগিরই আমাকে তাঁর কাছে যেতে হবে। কেননা বেশীক্ষণ একলা থাকলে তিনি রাগ করে স্বর্গে চলে যাবেন।

তাছাড়া আমি স্বর্গ থেকে কতকগুলো আশ্চর্য সুন্দর পোষাক এনেছি। স্বর্গের দেবতারা আর দেবদূতেরা সেই সব পোষাক পারেন। সেই সব পোষাকও আমি সেই বনে রেখে এসেছি। এই পোষাকগুলোর এমন অসাধারণ শক্তি আছে যে ওগুলো যে গায়ে পরবে সে সোজা উড়ে স্বর্গে চলে যেতে পারবে। কাজেই সম্রাট, আমাকে এখনি সেই বনে যেতে হবে। দেরী করলে স্বর্গের রাণী আর স্বর্গের পোষাক সব আবার স্বর্গে চলে যাবে। সেজন্য আপনি যে সব প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর এখন দিতে পারছি না। পরে আবার এসে সময়মত উত্তর দেব."

বীরবলের কথা শুনে সম্রাটের মনে আরও সন্দেহ হল। জিজ্ঞেস করলেন।—"বীরবল, তুমি সেই স্বর্গের রাণীকে আর স্বর্গের পেযাক-গুলো তোমার সঙ্গে এই রাজসভায় আনলে না কেন?

বীরবল বললেন—"সম্রাট, তিনি হলেন স্বর্গের রাণী। রাজসভায় আসতে হলে তাঁকে যোগ্য সম্মান দেখাতে হবে ত। আপনি হুকুম দিন মন্ত্রী আর অমাত্যদের সঙ্গে নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা করে, হাতী-ঘোড়া নিয়ে বাজনা বাজিয়ে দামী চতুর্দোলায় চড়িয়ে

স্বর্গের রাণীকে আর স্বর্গের পোষাকগুলো রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসি।”

সম্রাট প্রধান মন্ত্রীকে বললেন—“বীরবল যা বলছে তাই কর! স্বর্গের রাণী আর স্বর্গের পোষাক দেখতে আমার মন উৎসুক হয়ে রয়েছে।”

প্রধান মন্ত্রী বীরবলের নির্দেশ মত মন্ত্রী, অমাত্য, সভাসদদের নিয়ে বীরবলের সঙ্গে চললেন। রাজধানী ছাড়িয়ে অল্প দূরে গিয়ে তাঁরা এক বনের সামনে এলেন। বটে ঢুকে তাঁরা এক প্রাসাদ দেখতে পেলেন গাঢ় লাল আর সোনালী পাথরে তৈরী সেই প্রাসাদের সৌন্দর্যের আর তুলনা নেই।

অবাক হয়ে মন্ত্রী অমাত্য সভাসদেরা প্রাসাদের সৌন্দর্য দেখছেন এমন সময় বীরবল বলে উঠলেন—"এই প্রাসাদে স্বর্গের রাণী থাকেন। আমি তাঁকে ডাকছি, এখনি তিনি স্বর্গের পোষাক পরে এসে দাঁড়াবেন। প্রাসাদের লাল পাথরের বারান্দার দিকে চেয়ে দেখুন।”

বীরবলের কথা শুনে মন্ত্রী আর সভাসদেরা লাল পাথরের বারান্দার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে দেখতে লাগলেন।

বীরবল মন্ত্র পড়বার মত সুর করে গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন—“হে স্বর্গের রাণী দেখা দাও, হে স্বর্গের রাণী দেখা দাও, হে স্বর্গের রাণী দেখা দাও।”

মন্ত্রী অমাত্য সভাসদেরা এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। চোখের পলক আর পড়ে না। কিন্তু কোথায় কি—কোথায়ই বা স্বর্গের রাণী কোথায়ই বা স্বর্গের পোষাক।

বীরবল তাঁদের হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন “আমার একটা বড় ভুল হয়ে গেছে। একটা কথা আপনাদের বলা উচিত ছিল। কথাটা এই যে স্বগের রাণী আমাকে বলেছেন যে তিনি হলেন স্বর্গের রাণী। তাঁর মন স্বর্গের নন্দনকাননের মত পবিত্র। সেজন্য যে সব লোকের মনে দুষ্ট বুদ্ধি নেই, যারা অসাধু নয়, শুধু

তারাই তাঁকে দেখতে পাবে।

এইবার আপনারা লাল পাথরের বারান্দার দিকে চেয়ে দেখুন। ওই যে স্বর্গের রাণী এসে দাঁড়ালেন। ওঃ কি রূপ, চোখ আমার ঝলসে গেল। দেখতে পাচ্ছেন তো? দেখুন দেখুন, পৃথিবীর কোন লোকে স্বর্গের রাণীকে এ পর্যন্ত দেখেনি।"

প্রধান মন্ত্রী কিংবা সভাসদেরা কেউ কিছু দেখতে পেলেন না। কিন্তু কি করে সে কথা স্বীকার করেন। স্বীকার করা মানেই হল নিজেদের দুষ্ট লোক আর অসাধু বলে মেনে নেওয়া।

সর্বপ্রথম প্রধান মন্ত্রী বলে উঠলেন—"হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি বই কি!" ওঃ কি রূপ স্বর্গের রাণীর। ওই যে তিনি আমার দিকে চেয়ে হাসলেন, যেন হীরা মাণিক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।"

প্রধান মন্ত্রীর কথা শেষ হতে না হতে অন্য সব মন্ত্রী আর সভাসদেরা এক সঙ্গে বলে উঠলেন—"আমরাও দেখতে পাচ্ছি, আমরাও দেখতে পাচ্ছি। স্বর্গের রাণীর রূপের ছটায় চারদিক আলোকিত হয়ে গেছে। এত রূপ কি আর পৃথিবীতে কারও আছে।"

নিজেদের সাধু প্রমাণ করার জন্য তাঁরা সবাই যেন মরিয়া হয়ে উঠলেন। বীরবলকে বলতে লাগলেন—"চলুন চলুন, এখনি প্রাসাদে ঢুকে সমারোহ করে স্বর্গের রাণীকে নিয়ে সম্রাটের কাছে যাই।"

বীরবল তাঁদের উচ্ছ্বাস দেখে হেসে বললেন—"একটু অপেক্ষা করুন। সম্রাটের কাছ থেকে আর একবার অনুমতি নিয়ে আসি।"

তখন সবাই মিলে সম্রাট আকবরের কাছে গিয়ে বললেন—"সম্রাট, আমার সেই স্বর্গের রাণীকে দেখেছি! আশ্চর্য রূপ তার। গভীর বনের মধ্যে বিরাট এক প্রাসাদে তিনি রয়েছেন। আপনি অনুমতি দিন আমরা জঁকজমক করে তাঁকে আপনার প্রাসাদে নিয়ে আসি।"

মন্ত্রী ও সভাসদদের কথা শুনে সম্রাটের নিজেরও খুব কৌতূহল হল। তিনি বললেন—"চলুন আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব

স্বর্গের রাণীক যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসি।"

জাঁকজমক করে রাজপ্রাসাদ থেকে শোভাযাত্রা বেরোল। সম্রাট আকবর শোভাযাত্রার সামনে দামী রাজপোষাক পরে সাদা হাতীর পিঠে চড়ে চললেন, তাঁর পাশে তেজীয়ান ঘোড়ায় চড়ে বীরবল চললেন। তাঁদের পিছনে সভাসদেরা, মন্ত্রীরা আর হাতী ঘোড়া উট চলল। শোভাযাত্রার মাঝখানে একটা খালি সোনার চতুর্দোলা বাহকেরা বয়ে নিয়ে চলল।

শিগগির সবাই বনের মধ্যে, সেই প্রাসাদের সামনে এসে পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে বীরবল সেই একই কথা সম্রাট আকবরকে বললেন। বললেন—"সম্রাট, চেয়ে দেখুন, স্বর্গের রাণী লাল পাথরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আপনার দিকে চেয়ে হাসছেন। তিনি বলেছেন—"পৃথিবীর কোন অসাধু লোক কিংবা দুষ্ট লোক তাঁকে দেখতে পাবে না।

সম্রাটও বীরবলের কুটবুদ্ধির ফাঁদে পড়লেন। মন্ত্রী অমাত্য সভাসদদে সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে অসাধু আব দুষ্টলোক বলতে পারলেন না। কাজেই ত্যঁকেও বলতে হল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমিও দেখতে পাচ্ছি। কি আশ্চর্য সুন্দরী ওই স্বর্গের রাণী!"

প্রধান মন্ত্রী আর সভাসদেরা বলতে লাগলেন—"সম্রাট। অনুমতি দিন। আমরাই প্রথমে প্রাসাদে ঢুকে সাত তলায় উঠি। সেখানে গিয়ে সর্গের রাণীকে যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসি।"

বীরবল বললে—"মন্ত্রীমশায়, একটা কথা মনে রাখবেন। তিনি হলেন স্বর্গের রাণী। স্বর্গের পোষাক না পরলে কেউ তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না।"

এই বলে বীরবল হাসতে হাসতে প্রধান মন্ত্রী আর সভাসদদের দিকে হাত বাড়িয়ে পোষাক বিলি করবার অভিনয় করতে লাগলেন।

তাঁরাও সবাই এমনি বোকা বনে গেছেন যে সেই অদৃশ্য পোষাক

হাত দিয়ে ধরে নেবার ভান করলেন। আর নিজেদের সুন্দর পোষাক খুলে ফেলে সেই পোষাক পরবার ভান করতে লাগলেন। কেউই সাহস করে বলতে পারলেন না যে, কোন পোষাক দেওয়া হয়নি। কেননা তা হলেই নিজেদের অসাধু ও দুষ্টলোক বলে মেনে নিতে হবে। সেই অবস্থায় মাত্র ভিতরের সামান্য পোষাক পরে তাঁরা সবাই প্রাসাদের সাত তলায় উঠলেন, সেখান থেকে আবার নেমে এলেন। ভান করতে লাগলেন যেন স্বর্গের রাণীকে নিয়ে চলেছেন।

তারপর সেই বিরাট শোভাযাত্রা জাঁক-জমক করে বাজনা বাজিয়ে সম্রাটের প্রাসাদের দিকে চলল। শোভাযাত্রা রাজধানীর কাছে এসে পড়ল।

স্বর্গের রাণীকে দেখবে বলে দলে দলে প্রজারা এসে দাঁড়িয়েছে। শোভাযাত্রা সামনে আসতেই অবাক হয়ে প্রজারা দেখল প্রধান মন্ত্রী আর সভাসদেরা অতি সামান্য ভিতরের পোষাক পরে চলেছেন। শুধু সম্রাট আর বীরবল নিজেদের পোষাক পরে রয়েছে। শোভাযাত্রার মাঝখানে একটি খালি সোনার চতুর্দোলা বাহকেরা বয়ে নিয়ে চলেছে। এই দৃশ্য দেখে প্রজারা ঠাট্টা করে হাসতে আরম্ভ করল।

প্রধান মন্ত্রী আর সহ্য করতে পারলেন না। রেগে উঠে চীৎকার করে বললেন—"সম্রাট, এ সবই বীরবলের ধাপ্পাবাজি। এই চতুর্দোলায় স্বর্গের রাণীও নেই, আর আমারাও স্বর্গের পোষাক পরিনি। এ শুধু আমাদের বোকা বানান হল আর প্রজাদের কাছ অপদস্থ করা হল।"

প্রধান মন্ত্রীর কথা শেষ হতে না হতেই সভাসদেরা চীৎকার করে উঠলেন "সম্রাট, প্রধান মন্ত্রীর কথা সত্য। বীরবল আমাদের সবাইকে প্রজাদের সামনে অপদস্থ করেছে। আমরা প্রতিকার চাই।"

সম্রাট অনেক আগেই সব ব্যাপারটা বুঝেছিলেন আর বীরবলের

সবাইকে ঠকাবার কৌশল দেখে খুব মজা পাচ্ছিলেন। কাজেই তিনি একটুও রাগ করলেন না। গম্ভীর হয়ে বললেন—"বরবল, এঁদের অভিযোগ শুনলে ত ? এখন তোমার কি বলবার আছে ?"

বীরবল বললেন—"সম্রাট, এঁদের কথা যে সত্য সে আপনি বুঝেছেন ! কিন্তু চার মাস আগে রাজসভায় আপনি যে কথা বলেছিলেন তা মনে করুন। সেদিন আপনি বলেছিলেন—যদি আমি রাজ্য শুদ্ধ সবাইকে এমনি কি স্বয়ং সম্রাটকে, প্রধান মন্ত্রী ও সভাসদদের পর্যন্ত বুদ্ধির কৌশলে হারাতে পারি তা হলে আপনি আমাকে যথেষ্ট পুরস্কার দেবেন। সেজন্য যদি—কারো অনিষ্ট হয় বা কেউ বিরক্ত হয় তাতেও আমার কোন ক্ষতি হবে না। সম্রাট, এখন আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করুন।"

সম্রাট হাসতে হাসতে বললেন—"বীরবল, সেকথা আমার মনে আছে। তুমি যে বুদ্ধির কৌশল আমাদের সবাইকে হারিয়ে দিয়েছ এতে আমি খুশি হয়েছি। তোমায় আমি যথেষ্ট পুরস্কার দেব। আর প্রধান মন্ত্রী ও সভাসদেরা সবাই স্বীকার করলেন যে তোমার রসিকতার তুলনা নেই।"

সম্রাটের কথা শুনে প্রধান মন্ত্রী এবং সভাসদেরাও রাগ ভুলে গিয়ে বীরবলের বুদ্ধির প্রশংসা করতে লাগলেন। বলা বাহুল্য সম্রাট প্রিয় বয়স্য বীরবলকে তাঁর রসিকতার জন্য প্রচুর পুরস্কার দিলেন।

———

নিশ্চিন্তপুরের মহারাজা

হেমেন্দ্রকুমার রায়

বৃষ্টি পড়ে ঝুপঝুপিয়ে, বিদ্যুৎ ফোটে ঝক্‌ঝকিয়ে, বজ্র হাঁকে ঝন্‌ঝনিয়ে, সারা দিন ধ'রে চলেছে এই এলোপাতাড়ি হুলুস্থূলু ব্যাপার। আড্ডাঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে মনে হ'ল, তার ভিতরেও হুলুস্থূলু ব্যাপার চলেছে।

দরজার চৌকাঠে পা দিয়েই জিজ্ঞেস করলুম, "এত চিল্লাচিল্লী কেন, কানে তালা ধ'রে যায়।"

জনৈক আড্ডাধারী একদিকে অঙ্গুলি চালনা ক'রে বললে "বাস্তুসাপ!"

ঘরের কোণে দৃষ্টিচালনা ক'রে দেখা গেল, একটা ক্ষত-বিক্ষত কালো সাপের মৃতদেহ। মন্‌টা খচ্‌ ক'রে উঠল। আমি সাপ মারা পছন্দ করি না।

আড্ডাধারীরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধজেতার মত সগর্বে জানিয়ে দিলে, "আমরা মেরেছি।"

বললুম, শুনেছি বাস্তুসাপদের মারতে নেই। তারা অহিংসক।"

—"যাও, যাও, ও সেকেলে উক্তি আমরা মানি না। একেলে যুক্তি বলে, সাপ দেখলেই মারবে।"

তারপর সুরু হ'ল গল্প। প্রত্যেকেই এক-একটি গল্প ব'লে প্রমাণিত করতে চাইলেন যে, বাস্তবিকপক্ষে বাস্তুসাপ অহিংসক নয়।

আমি চুপচাপ শুনছি দেখে নিতাই খুড়ো বললেন, "কি হে, তুমি কোন বাস্তুসাপের গল্প জানো না?"

—"আজ্ঞে না, আমি কেবল একটা উদ্বাস্তু পাপের কেচ্ছা জানি।"

—"উদ্বাস্তু সাপ!"

—হ্যাঁ, যে সাপ বাস্তু খুঁজে পায়নি, বনবাদাড়ে থাকে।"

—"তাই সই, তাই সই। বাদলার বাজারে যে-কোন গল্প চালু হ'তে পারে। কিন্তু সত্য ঘটনা তো?"

—"নিশ্চয়। আমার জীবনেরই গল্প। কবিরা মোলায়েম ভাষায় যাকে বলেন, জীবনস্মৃতি।"

*   *   *

গোড়াতেই ব'লে রাখি, আমার গল্পের শিরোনামা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকতে পারে। কারণ এটা সাপের গল্প, না নিশ্চিন্তপুরের মহারাজার গল্প তা' ঠিক জানি না।

মফঃস্বল বন্ধুর বাড়ীতে দিনকয়েকের জন্যে বেড়াতে গিয়েছিলুম।

আদর-আপ্যায়নের ঘটার কথা ব'লে আমার কাহিনীকে ভারাক্রান্ত করব না—এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, বন্ধুবর অতিথিসেবা করেছিলেন কায়মনোবাক্যে।

জায়গাটিও মনে ধরল। যখন-তখন গণ্ডা গণ্ডা রেডিয়ো-যন্ত্র কর্ণকে যন্ত্রনা দেয় না; কিংবা পাশের বাড়ীর খুকী ভাঙা হার্মোনিয়ম নিয়ে তীব্র স্বরে সা-রে-গা-মা সাধে না; পথে পা বাড়ালেই মোটর-গাড়ীগুলো প্রচণ্ড উৎসাহে প্রাণবধ করতে ছুটে আসে না; কিংবা, ভিড়ের ভিতরে ঢুকে গাঁটকাটাদের কাঁচি থেকে পকেট সামলাতে হয় না। হাটে-মাঠে-বাটে অকুতভয়ে নিশ্চিন্ত প্রাণে বেড়িয়ে বেড়াও; নির্মল বায়ু সেবন কর, সুনীল আকাশ দেখ, পাখীর গান শোনো, ফুলের গন্ধ শোঁকো—এক নয়া পয়সাও খরচ করতে হবে না। তোফা!

সেদিনও বেড়াতে বেড়াতে মনে মনে মফঃস্বলের প্রশংসা করছি, হটাৎ দেখি মস্তবড় একখানা পাঁচিল-ঘেরা বাড়ীর ফটক সশব্দে খুলে পাঁচ-ছয়জন জোয়ান জোয়ান লোক ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা লাঠি নিয়ে হৈ হৈ

ক'রে আমার দিকে ছুটে আসতে লাগল।

কি রে বাবা, ডাকাত নাকি ? তবেই তো, মফঃস্বলের আর সব ভালো, কেবল সেখানকার ডাকাতরা ভদ্রলোক নয়! অন্ততঃ খবরের কাগজের রিপোর্টে তাদের শিস্টতার পরিচয় পাওয়া যায় না।

অসহায় ভাবে এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগলুম, কিন্তু চারিদিক জনশূন্য।

লোকগুলো হন্তদন্তের মত কাছে এসে পড়ল। একজন জিজ্ঞাসা করলে, "ও মশাই, শুনছেন ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনছি বৈকি।"

—"এদিকে কারুকে দেখেছেন ?"

—"কাকে ?"

—"একটা পাগলকে। খুনে পাগল, দুটো খুন করার পর গারদে এসেছে, আজ কোন ফাঁকে আবার পালিয়ে গিয়েছে। আমরা তাকেই খুঁজছি।"

—"না, আমি কারুকেই দেখিনি।"

লোকগুলো গোলমাল করতে করতে একদিকে ছুটল। নিশ্চয় পাগলা-গারদের রক্ষী। আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

পল্লীশ্রী দেখতে দেখতে এবং শিস দিতে দিতে আবার এগিয়ে চললুম মনের সুখে। খানিক দূর গিয়েই পেলুম একটি নিরিবিলি ঠাঁই। চারিধারে পাখীডাকা গাছের ভিড়, ছায়মাখা শ্যামলতা, ঝিল্‌মিলে পদ্মপুকুর, কালো জল আলো ক'রে ফুটে আছে কত যে পদ্মফুল! আহা, মরি মরি!

রবি ঠাকুরের একটি গান মনে এল—

যেদিন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই,
আমি ছিলাম অন্য মনে।
মাঝে মাঝে হিয়া আকুল প্রায়,
স্বপন দেখে চমকে উঠে চায়—

তারপরে সত্যসত্যই আমাকে ভয়ানক চম্‌কে এবং দিবাস্বপ্ন ভেঙে গিয়ে পিছন থেকে বাজখাঁই গলায় কে ব'লে উঠল, "পথে-ঘাটে অন্যমনে থেকো না হে, বিপদে পড়বে!"

চট্ করে পিছন ফিরে দেখি, ঠিক যেন মাটি ফুঁড়েই আবির্ভূত হয়েছে একটা ভীমদর্শন বিশাল মূর্ত্তি—আমার চেয়ে প্রায় এক হাত উঁচু, পরণে পাঞ্জাবী ও পায়জামা, মাথা উস্কখুস্ক, রুক্ষ চুল, পায়ে জুতো নেই। চোখদুটো কট্‌মটে।

বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনি কোথা থেকে এলেন?"

—ঐ কচুবনে লুকিয়ে ছিলুম।"

—"লুকিয়ে ছিলেন! কেন?"

—"আমার প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

—"আপনি কে?"

—"নিশ্চিন্তপুরের মহারাজা।"

আর বুঝতে বাকি রইল না আমি কোন্ মহাত্মার হস্তগত হয়েছি। দুরু দুরু প্রাণে নিজের কর্ত্তব্য স্থির করতে লাগলুম। ভাবলুম, মিষ্ট কথায় একে ভোলাবার চেষ্টা করা যাক্।

করুণ স্বরে ডাকলুম, মহারাজ!"

—"কি পশু?"

—"আজ্ঞে মহারাজ, আমার নাম তো পশু নয়।"

—"নয় কি রকম? তুমি কি শাস্ত্র পড়োনি? তুমি কি জানো না বলির পশু কাকে বলে?"

—"আজ্ঞে মহারাজ, আমি কি বলির পশু?"

—"নিশ্চয়! আমি যে মনে মনে তোমাকেই বলি দেব ব'লে স্থির করেছি!"

আম্‌তা ক'রে বললুম, সেটা কি সঙ্গত কার্য্য হবে?"

—"কেন হবে না পশু?"

—"হে মহারাজ, অবধান করুন। লোকে মা কালীর সামনে

পাঁঠাবলি দেয় মাংস খাবার লোভে। কিন্তু আমি তো পাঁঠা নই, মানুষ। নরমাংস আপনার কি ভালো লাগবে ?"

মহারাজ একগাল হেসে বললেন, "আরে সেইটেই তো আমি এক্সপেরিমেণ্ট করতে চাই। নরমাংস এর আগে তো ভক্ষণ করিনি!"

দুই হাত জোড় ক'রে বললুম, "কেন মহারাজ, এর আগে আপনি তো আরো দুইবার নরবলি দিয়েছিলেন, তখনও কি এক্সপেরিমেণ্ট করা হয়নি ?"

মহারাজ সচকিত কণ্ঠে বললেন, "আমি যে আরো দুইবার নরবলি দিয়েছি, এ কথা তুমি জানলে কেমন করে ?"

—"একটু আগেই পাঁচ-ছয়জন লাঠিয়ালের মুখে শুনলুম।"

মহারাজ শশব্যস্ত হয়ে বললেন, "পাঁচ-ছয়জন লাঠিয়াল ? :আমার বিদ্রোহী প্রজাগণ ? তাহ'লে বলি দেবার ব্যবস্থাটা এখনি করতে হবে—বিলম্বে কার্য্যহানির সম্ভাবনা।"

শুনে অঙ্গ জল হয়ে গেল। কিন্তু সেই অবস্থাতেই না ব'লে পারলুম না—"কোথায় বলি দেবেন মহারাজ ? এখানে তো মন্দির-টন্দির কিছুই দেখছি না, কোন দেবীর মূর্তিও নেই!"

গম্ভীর কণ্ঠে নিশ্চিন্তপুরের মহারাজা বললেন, "পশু, তুমি হচ্ছ হাঁদা-গঙ্গারাম! মন্দির প্রতিষ্ঠা করি আর প্রতিমা গড়ি আমি মনে মনেই!"

কিঞ্চিৎ আশান্বিত হয়ে বললুম, "আজ্ঞে মহারাজ, তাহ'লে মনে মনেই খাঁড়া বানিয়ে আপনি মনে মনেই বলি দেন বুঝি ?"

হো হো রবে অট্টহাস্য ক'রে মহারাজা বললেন, "পাগল না মাথা খারাপ! মনে মনে কখনো খাঁড়া বানানো যায় ? এই দেখ!" —জামার তলা থেকে ফস্ ক'রে বেরুলো একখানা চক্চকে ভোজালি!

রোমাঞ্চিত দেহে, চমৎকৃত চক্ষে ধারালো ভোজালিখানার দিকে তাকিয়ে রইলুম দস্তুরমত মুগ্ধ চক্ষে।

হঠাৎ এক লাফে এগিয়ে এসে খপ্ ক'রে আমার একখানা হাত সজোরে চেপে ধ'রে মহারাজা বললেন, চল পশু, আর দেরি নয়। ওদিকে গোলমাল হচ্ছে শুনতে পাচ্ছ না? নিশ্চয় বিদ্রোহী প্রজারা এই দিকেই আসছে।"

আমার গায়ের জোরে সে বজ্রমুষ্টির বাঁধন ছাড়ানো অসম্ভব। আমার চলবার শক্তিও ছিল না এবং আমাকে মাটিতে পদচালনা করতে হ'ল না, কারণ মহারাজাই আমাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন।

এবং তারপরেই একটা ঝুপ্‌সী বটগাছের তলায় গিয়ে আচম্বিতে কিসে হুঁচোট খেয়ে দড়াক ক'রে হলেন পপাতধরণীতলে! অচিন্তনীয় কাণ্ড!

আর কি সে সুযোগ ছাড়ি? লাফ মেরে বটগাছের গুঁড়ি জড়িয়ে ধ'রে আমি তড়বড় ক'রে উপরে উঠতে লাগলুম।

কিন্তু মহারাজাও আশ্চর্য-রকম চটপটে! পর-মুহূর্তেই তড়াক ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে বৃক্ষকাণ্ড ধ'রে তিনিও হলেন ঊর্দ্ধগামী!

নীচে থেকে চীৎকার শুনলুম, "ক্ষান্ত হও পশু, নইলে এই ভোজালী ছুঁড়ে তোমাকে বধ করব।"

আমি প্রতি মুহূর্তে পৃষ্ঠভেদী ভোজালির খরস্পর্শ অনুভব করতে করতে বিনা বাক্যব্যয়ে প্রাণপণে উপরে উঠতে লাগলুম।

কিন্তু তারপরেই এক ভয়াবহ কাণ্ড!

গাছের গুঁড়ির উপরে বিশ্রাম করছিল প্রকাণ্ড একটা গোখ্‌রো সাপ, আমাকে দেখেই সে ফণা তুলে ফোঁস করে মারলে এক ছোবল!

কিন্তু তার আগেই ভয়ে অবশ হয়ে গিয়ে আমি হাত ছেড়ে দিলুম এবং দশ-বারো হাত উঁচু থেকে ঝুপ্ ক'রে প'ড়ে গেলুম মাটির দিকে।

সেই বিষধর সর্পই আমার জীবন দাতা, কারণ দশ-বারো হাত উঁচু থেকে ঘাস জমিতে প'ড়ে আমি খুব বেশী আঘাত পেলুম না এবং

তাকে না দেখলে আমি কখনো এই ভাবে মাটির উপরে অবতীর্ণও হতে সাহস করতুম না।

তারপর ?

সাপের সামনে প'ড়ে নিশ্চিন্তপুরের মহারাজা বাহাদুর কি করলেন তা' দেখবার সময় আমি পাইনি, মাটি থেকে উঠেই দিগ্-বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে বুলেটবেগে আমি দৌড় মারলুম মনে মনে এই কথাই বলতে বলতে—জয় মা কালী কলকাতাওয়ালী, তোমার আশ্রয়ে যাবার জন্যে পরের ট্রেনেই কলকাতায় যাত্রা করব!

———

ফাঁকা ঢাক

মণীন্দ্র দত্ত

ক্ষেতের ভিতর দিয়ে হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে যাচ্ছিল মজুর এমেলিয়ান। এমন সময় কে যেন তাকে পিছন থেকে ডাকল। এমেলিয়ান ফিরে দেখল, একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকটি বলল, এমেলিয়ান, তুমি বিয়ে করো নি কেন?

এমেলিয়ান জবাব দিল, কেমন করে বিয়ে করি বলো? পরনের এই কাপড় ছাড়া আর তো কিছুই আমার সম্বল নেই। কে আমাকে বিয়ে করবে?

—তুমি আমাকে বিয়ে করো, মেয়েটি বলল।

—কথাটা তো ভালই বলেছ, এমেলিয়ান বলল, কিন্তু বিয়ে করে আমরা থাকব কোথায়? খাব কি?

মেয়েটি বলল, থাকা-খাওয়ার ভাবনা কি? আর একটু কম ঘুমিয়ে আর একটু বেশি কাজ করলেই খাওয়া-পরার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—বেশ তো, বিয়ে তা'হলে হয়ে যাক। কোথায় বিয়ে হবে বল তো?

—শহরে চল।

শহরে যেয়ে দুজন বিয়ে করল। তারপর শহরের শেষে একটা বাড়ি নিয়ে দুজনে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগল।

একদিন—

রাজা চলেছে গাড়ি হাঁকিয়ে এমেলিয়ানের বাড়ির পাশ দিয়ে—

হঠাৎ এমেলিয়ানের বৌকে দেখতে পেয়ে রাজা গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে ?

সে জবাব দিল, আমি মজুর এমেলিয়ানের বৌ।

—সে কি ? এমন সুন্দরী হয়ে, তুমি একটা মজুরকে বিয়ে করতে গেলে কেন ? তুমি তো রানী হবার যোগ্য।

—আপনার প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমার কাছে আমার মজুর স্বামীই ভাল।

অগত্যা রাজা প্রাসাদে ফিরে গেল। কিন্তু এমেলিয়ানের স্ত্রীর সুন্দর মুখখানা সে কিছুতেই ভুলতে পারল না। সারারাত একটু ঘুম পর্যন্ত হল না।

সকালবেলা রাজা চাকর-বাকরদের বলল এর একটা বিহিত করতে। তারা পরামর্শ দিল, আপনি এমেলিয়ানকে ডেকে এনে রাজবাড়িতে কাজে লাগিয়ে দিন। আর তার ঘাড়ে এত বেশি কাজ চাপিয়ে দিন যাতে সে খাটতে খাটতে মারা যায়। তখন আপনি অনায়াসে তার বৌকে বিয়ে করে ঘরে আনতে পারবেন।

পরামর্শটা রাজার খুব ভাল লাগল। তখুনি এমেলিয়ানকে ডেকে এনে কাজে লাগিয়ে দেওয়া হল। এমেলিয়ানের আসবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু রাজার হুকুম, না মেনে উপায় কি ? আসবার সময় বৌ তাকে বলে দিল, তুমি যাও, সারাদিন রাজবাড়িতে কাজ করে সন্ধ্যেয় বাড়ি ফিরে এসো।

রাজবাড়িতে এমেলিয়ানের ঘাড়ে দুজনের কাজ চাপিয়ে দেওয়া হল। এমেলিয়ান প্রমাদ গুনল। এত কাজ শেষ করে সে বাড়ি যাবে কখন। কিন্তু কি আশ্চর্য ! সন্ধ্যা হবার সাথে সাথেই তার হাতের কাজ সব শেষ হয়ে গেল। খুশিমনে সে বাড়ি ফিরে গেল।

পরদিন তাকে কাজ দেওয়া হল চারগুণ। কিন্তু সেদিনও সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই তার কাজ শেষ হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে সে বৌকে বলল, নাঃ, কাজ করাতে করাতে এরা আমাকে মেরে ফেলবে।

বৌ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, কাজের জন্য তুমি ভেবো না। একমনে কাজ করে যেয়ো, তা'হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

হলোও তাই। দিনের পর দিন চাকররা এমেলিয়ানের কাজের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে লাগল, আর সেও নির্বিঘ্নে সন্ধ্যার আগেই সব কাজ শেষ করে যথারীতি বাড়ি ফিরতে লাগল।

এমনি করে এক সপ্তাহ কেটে গেল। রাজা তো রেগে আগুন। চাকর-বাকরদের ধমকে বলল, কি করছ তোমরা সব ? বসে বসে গিলছ এক কাঁড়ি করে, আর কাজের বেলায় লবডংকা। বেটা মজুর তো দেখছি বহাল তবিয়তে কাজ করে চলেছে।

চাকররা হাত জোড় করে বলল, দোহাই হুজুর, আমাদের কোন কসুর নেই। কিন্তু ও ব্যাটা নির্ঘাত যাদু জানে। যত কাজই ওর ঘাড়ে চাপাই, সন্ধ্যার মধ্যে ও ঠিক করে ফেলে। তার চেয়ে হুজুর এক কাজ করুন। একদিনের মধ্যে ওকে একটা গীর্জা বানিয়ে দিতে বলুন। যদি না পারে ওর গর্দান নেবেন।

সেই হুকুমই হল এমেলিয়ানের উপর। মনের দুঃখে মুখ কালো করে বেচারা বাড়ি ফিরল সেদিন। বৌকে বলল, শিগ্‌গির তৈরী হও, আজ রাতেই আমাদের পালাতে হবে।

বৌ বলল, কেন ? পালাব কেন ?

—রাজা হুকুম করেছেন, এক দিনের মধ্যে একটা গীর্জা বানিয়ে দিতে হবে। না পারলে আমার গর্দান যাবে। এ অবস্থায় পালানো ছাড়া আর উপায় কি ?

বৌ হেসে বলল, কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায় ? যেখানেই যাই রাজার লোকজন আমাদের ধরে নিয়ে আসবে। তার চেয়ে সাধ্যমত কাজ করে যাও, তারপর যা হয় তাই হবে।

—কিন্তু এ যে মানুষের সাধ্যের অতীত, এ কাজ আমি করব কেমন করে ?

—সে যা হয় হবে। এখন খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়। সকালে

উঠেই দেখবে সব কাজ ঠিক হয়ে।

বেচারা এমেলিয়ান ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল খানিক বৌয়ের মুখের দিকে; তারপর শুতে গেল।

ভোরবেলা বৌ তাকে ডেকে বলল, শিগ্‌গির উঠে পড়। কাজে যাও, গীর্জা প্রায় তৈরি। এই হাতুড়ি আর পেরেক নিয়ে যাও। দিনভর খেটে বাকি কাজটা শেষ করে দাও।

ঘুম থেকে উঠে রাজামশায়ের তো চক্ষু চড়কগাছ। রাজপ্রসাদের ঠিক সাম্‌নে ফাঁকা মাঠের মাঝখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে একটা মস্ত গীর্জা। এমেলিয়ান আপন মনে হাতুড়ি পিটিয়ে পেরেক ঠুকছে একটার পর একটা।

চাকরদের পরামর্শে তখুনি নতুন হুকুম জারি করল রাজা — এমেলিয়ানকে কালকের দিনের মধ্যে একটা নদী বইয়ে দিতে হবে প্রাসাদের চারপাশে; তাতে পাল তুলে ভেসে বেড়াতে অনেকজাহাজ।

হুকুম শুনে এমেলিয়ান আরো ঘাবড়ে গেল। তার বৌ সব কথা শুনে বলল, কোন চিন্তা নেই। তুমি খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়।

ভোরবেলা তাকে ডেকে তুলে বৌ বলল, শিগগির কাজে যাও। সব ঠিক আছে। শুধু নদীর ধারে এক জায়গায় খানিকটা মাটি পড়ে আছে। একটা কোদাল নিয়ে সারাদিনে সেটা ঠিক করে দাওগে।

ঘুম ভেঙে রাজার তো আক্কেল গুড়ুম্। আরে! যেখানে জলের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না, সেখানে কুলু-কুলু রবে বয়ে চলেছে একটা নদী। সাদা পাল তুলে ভেসে চলেছে জাহাজ। আর কোদাল চালিয়ে তখনো কাজ করে চলেছে ব্যাটা মজুর।

—নাঃ, এ লোকটার অসাধ্য কিছু নেই, বলে রাজা তখুনি চাকরদের ডেকে শুধাল, একে নিয়ে কি করি বলো তো? এ যে কিছুতেই জব্দ হচ্ছে না!

অনেক ভেবে চাকররা একটা নতুন ফন্দি বাৎলে দিল, এক কাজ করুন হুজুর, এমেলিয়ানকে হুকুম করুন নাম-না-জানা দেশে যেয়ে

নাম-না-জানা জিনিস আনতে। তবেই বাছাধন ফাঁদে পড়বেন। যেখানেই সে যাক আপনি বলবেন সে দেশ তো নয়। আর যে বস্তুই সে আনুক, বলবেন সে বস্তু তো নয়। ব্যস তা'হলেই কর্ম ফতে।

প্রস্তাব শুনে রাজা ভারি খুশি। গোঁফ নাচিয়ে বলল, ঠিক বলেছ। এই ওষুধই ধরবে বলে মনে হয়।

তখুনি এমেলিয়ানকে ডেকে রাজা হুকুম দিল, তুমি আজই চলে যাও—কোন্ দেশে তা জানি না। আর এনে দাও—যে জিনিস আমি জানি না। যদি না পারো, তোমার গর্দান যাবে।

এমেলিয়ান বাড়ি ফিরে বৌকে সব কথা বলল। শুনে সেও এবার চিন্তিত হয়ে পড়ল। অনেক ভেবে-চিন্তে শেষটায় বলল, এখান থেকে অনেক—অনেক দূরে আমার এক বুড়ি দিদিমা থাকে, তুমি তার কাছে যাও। সে যা বলবে সেই মত কাজ করে যত তাড়াতাড়ি পার রাজপ্রাসাদে ফিরে আসবে। রাজার চাকররা নিশ্চয় আমাকে সেখানে ধরে নিয়ে যাবে। কিন্তু তুমি যদি দিদিমার কথামত কাজ করো, তা'হলে আমাকে ঠিক সময়ে উদ্ধার করতে পারবে।

বৌটি তখন একটা ঝোলার মধ্যে একটা মাকু ভরে সেটা স্বামীর হাতে দিয়ে বলল, এই মাকুটি দিলেই দিদিমা তোমাকে চিনতে পারবে।

ঝোলাটা কাঁধে ঝুলিয়ে বৌয়ের নির্দেশ মত এমেলিয়ান যাত্রা করল অনেক—অনেক দূরের পথে।

পথের পাশে এক জায়গায় অনেকগুলো সৈন্যকে বসে থাকতে দেখে এমেলিয়ান শুধাল, আচ্ছা ভাই, বলতে পার নাম-না-জানা দেশেই বা যাব কোন্ পথে, আর নাম-না-জানা জিনিসই বা পাব কেমন করে?

সৈন্যরা সবিস্ময়ে তাকে প্রশ্ন করল, সে জিনিস আনতে তোমাকে কে বলেছে?

—বলেছেন আমাদের রাজা, উত্তর দিল সে।

তখন সৈন্যরা বলল, দেখ ভাই, যেদিন সৈন্যদলে যোগ দিয়েছি। সেইদিন থেকে আমরাও চলেছি সেই নাম-না জানা দেশে, কিন্তু আজও পৌঁছতে পারি নি—আর খুঁজে মরছি সেই নাম-না-জানা জিনিস, কিন্তু আজও তার দেখা পাই নি। কাজেই তোমার প্রশ্নের জবাব আমরা দিতে পারব না।

এমেলিয়ান আবার হাঁটতে শুরু করে দিল। হাঁটতে হাঁটতে ঢুকল এক বনের মধ্যে। সেখানে একটা কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় বসে চরকায় সূতো কাটছে এক থুরথুরি বুড়ি। বুড়ি সূতো কাটছে আর কাঁদছে। তার দুইচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা। সেই ধারায় বার বার আঙুল ভিজিয়ে নিয়ে বুড়ি সূতো কাটছে চরকা ঘুরিয়ে।

এমেলিয়ানকে দেখে বুড়ি চীৎকার করে উঠল, তুমি এখানে এসেছ কেন?

সে তখন তাড়াতাড়ি ঝোলার ভিতর থেকে মাকুটা বের করে বুড়িকে দিয়ে বলল, আমার বৌ এটা পাঠিয়ে দিয়েছে।

মাকুটা দেখেই হাসি ফুটে উঠল বুড়ির মুখে। ফোঁকলা দাঁতে হেসে উঠে সে বলল, ওই দেখ, তুমি যে আমার নাত-জামাই। বস বস, বল সব খবর কি?

একে একে সব বৃত্তান্তই সে খুলে বলল। মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনে বুড়ি বলল, ঠিক আছে। তুমি আগে দুটো কিছু মুখে দাও, বিশ্রাম কর। তারপর আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

খাওয়া-দাওয়ার পর বুড়ি একটা সুতোর গুলি দিয়ে বলল, এই এই সুতোর গুলিটাকে তোমার সামনে গড়িয়ে দিয়ে সেইটের পাছে পাছে এগিয়ে যাও। যেতে যেতে সমুদ্রের ধারে দেখতে পাবে মস্ত বড় শহর। সেই শহরের একেবারে শেষের বাড়িতে যেয়ে রাত্রির মত আশ্রয় চাইবে। তুমি যা খুঁজতে এসেছ সে জিনিস সেখানেই পাবে।

এমেলিয়ান জিজ্ঞেস করল, সে জিনিস আমি চিনব কেমন করে ?

—যখনই এমন কোন জিনিস তুমি দেখতে পাবে মানুষ তার বাপ-মায়ের চেয়েও বেশী মান্য করে, তখনই বুঝে নেবে সেইটিই তোমার প্রার্থিত জিনিস। সেই জিনিস নিয়েই ছুটে যাবে রাজার কাছে। রাজা যদি বলেন, এটা সে জিনিস নয়, তখন তুমি বলবে, 'বেশ এটা যদি সে জিনিস না হয় তা'হলে এটাকে ভেঙে ফেলে দি।' বলেই সেটাকে বেশ করে বাজাতে বাজাতে নদীতে নিয়ে ভেঙে চুরে ফেলে দেবে। তা'হলেই ফিরে পাবে তোমার বৌকে—আর শুকোবে আমার চোখের জল।

বুড়ি দিদিমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুতোর গুলির পিছনে ছুটতে ছুটতে এমেলিয়ান পৌঁছে গেল সমুদ্রতীরের মস্ত শহরের একেবারে শেষের বাড়িতে। সেই বাড়িতে রাত কাটিয়ে ভোরবেলা ঘুম থেকে জেগেই সে শুনতে পেল, বাড়ির কর্তা তার ছেলেকে বলছে তাড়াতাড়ি উঠে বন থেকে জ্বালানি কাঠ কেটে আনতে। ছেলে কিন্তু সে কথায় কানই দিল না। 'এত ভোরে কে উঠবে' বলে আবার পাশ ফিরল।

একটু পরে তার মা ডাকল, তাড়াতাড়ি ওঠ বাবা। তোমার বাপের হাত-পা কন্‌-কন্‌ করছে। এ অবস্থায় তুমি জ্বালানি না আনতে গেলে কেমন করে চলবে ?

কিন্তু ছেলে বার কয়েক বিড়-বিড় করে কি যেন বলে আবার ঘুম দিল।

এমন সময় বাইরের রাস্তা থেকে একটা গুরুগম্ভীর শব্দ ভেসে এল। সেই শব্দ কানে আসতেই ছেলেটি তড়াক করে বিছানা থেকে উঠে ছটপট জামা কাপড় পরে এক দৌড়ে রাস্তায় চলে গেল।

ব্যাপার কি ?

এমেলিয়ান মনে মনে বলল, এই তো সেই জিনিস যাকে মানুষ বাপ-মায়ের চেয়ে বেশি মান্য করে। কাজেই দেখতে হচ্ছে

জিনিসটা কি !

তাড়াতাড়ি বাইরে এসে সে দেখল, একটি লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে। তার পেটের কাছে ঝোলান রয়েছে একটা জিনিস। লোকটি দুটো কাঠি দিয়ে সেই জিনিসটাকে অনবরত পিটছে। আর তার ফলে যে যে আওয়াজ হচ্ছে তাই শুনেই ছেলেটি বাইরে ছুটে এসেছে।

এমেলিয়ান বুঝতে পারল, এই জিনিসের কথাই বুড়ি দিদিমা বলে দিয়েছে। জিনিসটা দেখতে গোল, অনেকটা খোলের মত, দুইদিক চামড়া দিয়ে ঢাকা।

এমেলিয়ান এগিয়ে জিজ্ঞেস করল, এটা কি ভাই ?

তারা বলল, এটা ঢাক।

—এটা কি ফাঁকা ? এর ভিতরে কিছু নেই ?

—না, এর ভিতরে কিছুই নেই এটা একেবারেই ফাঁকা।

একটা খালি খোলের এত শক্তি ! সে তখন ঢাকটি তাদের কাছে চাইল। কিন্তু তারা কিছুতেই দিতে রাজী হল না। আগত্যা এমেলিয়ান সারাদিন তাদের পিছনে পিছনে গেল। রাত্রে ঢাকী যখন ঘুমিয়ে পড়ল তখন সে ঢাকটি নিয়ে দিল চম্পট।

ছুটতে ছুটতে হাজির হল নিজের শহরে—নিজের বাড়িতে। কিন্তু সেখানে দেখতে পেল না তার বৌকে। নিশ্চয় রাজার লোকেরা তাকে নিয়ে গেছে। ঊর্ধ্বশ্বাসে সে ছুটল রাজপ্রাসাদের দিকে।

রাজা বেরিয়ে এসে বলল, তুমি কোথায় গিয়েছিল ?

এমেলিয়ান তাকে সব বলল।

শুনে রাজা বলল, ঠিক দেশে তো যাও নি। তা কি এনেছ সেখান থেকে ?

গলায় ঝোলানো ঢাকটা দেখাল সে।

রাজা কিন্তু সেদিকে না চেয়েই বলে উঠল, এ জিনিস তো নয়।

এমেলিয়ান তখন চীৎকার করে বলে উঠল, এটা যদি ঠিক জিনিস না-ই হয় তা'হলে এটাকে ভেঙে টুকরো করে ফেলি। জাহান্নামে যাক এটা।

কথাগুলো বলেই এমেলিয়ান প্রাসাদের বাইরে এসে সজোরে ঢাকটা বাজাতে শুরু করে দিল। সেই ঢাকের বাজনা শুনে রাজার সৈন্য-সামন্ত সেপাই-শান্ত্রী যে যেখানে ছিল ছুটে এসে এমেলিয়ানের পিছু নিল। তাদের সবার মুখেই এক বুলি—'বলুন, আপনার কি আদেশ ?'

ব্যাপার দেখে রাজা তো একেবারে থ। দোতলা থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সে সৈন্য-সামন্তদের ফিরে আসতে আদেশ দিতে লাগল বার বার। কিন্তু কেউ তার কথা শুনলো না। ঢাকের বাজনার তালে তালে পা ফেলে সবাই চলল এমেলিয়ানের পিছনে পিছনে।

কি আর করে। দায়ে পড়ে রাজা হুকুম দিল, কে আছিস্, এমেলিয়ানের বৌকে তার স্বামীর কাছে পৌঁছে দিয়ে আয়! আর চেয়ে নিয়ে আয় তার ঢাকটা।

এমেলিয়ান বলল বৌকে ফিরে পেলাম, এ খুব খুশির কথা। কিন্তু ঢাক দিতে পারব না। আমাকে যে বলে দিয়েছে, ঢাকের কাজ শেষ হলেই এটাকে ভেঙেচুরে নদীর জলে বিসর্জন দিতে হবে।

এমেলিয়ান চলল নদীর দিকে। সৈন্য-সামন্তরা চলল তার পিছে পিছে। নদীতীরে পৌঁছে ঢাকটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে সে ফেলে দিল নদীর জলে। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য-সামন্ত সেপাই-শান্ত্রীরা ছুটে পালিয়ে গেল যে যার কাজে।

বৌয়ের হাত ধরে এমেলিয়ান বাড়ি ফিরে গেল। সেই থেকে রাজা আর কখনো তাদের পিছনে লাগে নি। মনের সুখে তারা ঘরকন্না করতে লাগল।

———

সম্পাদক সুরেশ্বর

ক্ষীতিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

সুরেশ্বরকে চেন ? আমাদের সুরেশ্বর ? হ্যাঁ হ্যাঁ, 'গুঞ্জন' কাগজের সম্পাদক সুরেশ্বরের কথাই বলছি। সুরেশ্বর ছেলেবেলা থেকেই একটু-আধটু কবিতা লিখতে পারত। স্কুল থেকে ফিরে তার বয়সী অন্যান্য ছেলেরা যখন ফুটবল নিয়ে মাঠের দিকে ছুটত সুরেশ্বর তখন ছোট একটি বাঁধানো খাতা নিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠত গিয়ে ছাদে। ছাদের নিরিবিলি কোণে, যেখানে ছোট্ট একটি অশথের চারা মাথা তুলেছে, তারই পাশে একা একা বসে সে কবিতা লিখত। তোমাদের মধ্যে যারা কবিতা লেখ তারা নিশ্চয়ই জান, কবিতা লেখার সব ভাল—শুধু মিলটুকু ছাড়া। তখনও আধুনিক অমিল কবিতার রেওয়াজ হয়নি (বেচারা সুরেশ্বর !) তাই অনেক সময় মনে ভাব এলেও সেই সঙ্গে ঠিকমত মিল আসত না। ভাবতে ভাবতে—ভাবতে ভাবতে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা পার হয়ে যেত, মাষ্টারমশাই এসে পড়তেন। ফলে সুরেশ্বরকে খাতা-পেন্সিল নিয়ে একেবারে 'কাব্য-লোক' থেকে 'অঙ্ক-লোকে' নেমে আসতে হ'ত। শিশু কবির এ দুর্ভোগ ভুক্তভোগী ছাড়া কে বুঝবে ?

কিন্তু এ সব দুর্ভোগ (যা থেকে বাল্মীকি-হোমারের কথা জানি না, রবিবাবুর মত কবিরাও রেহাই পান নি), সত্ত্বেও সুরেশ্বর লিখত।

সুরেশ্বর আর একটু বড় হ'ল, হাতও আর একটু পাকল। স্কুলের ছাপানো ম্যাগাজিনে তার লেখা গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ গিস্ গিস্ করে, সহপাঠিদের মধ্যে একটু খাতিরও হয়। যে সব ছাত্রের লেখা সেখানে

স্থান পায় না তারা হয় খাপ্পা। ম্যাগাজিনের ভারপ্রাপ্ত মাষ্টার-মশাইদের ওপর পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনে। সুরেশ্বর সম্বন্ধে আড়ালে বলে, "কোথা থেকে টুকে মেরে দিয়েছে! ও রকম আমরাও পারি!" কিন্তু—যেতে দাও ও-সব তুচ্ছ কথা।

কলেজ থেকে বেরোবার পর সুরেশ্বর লক্ষ্য করল লেখক হিসাবে তার একটু-আধটু নাম হয়েছে। চাকরীর বাজার তখন খুব খারাপ যাচ্ছে। পথে ঘাটে পাৎলুমের এত ছড়াছড়ি নেই। অবশ্য সুরেশ্বর-দের অবস্থা নেহাৎ মন্দ নয়। ব্যাকে প্রচুর টাকা। বাবা বললেন, "কি রে, চাকরির চেষ্টাই করবি, নাকি ব্যবসা-ট্যাবসা কিছু করতে চাস? ব্যবসার কথা শুনতে ভাল লাগে, কিন্তু করতে বড় মেহনৎ। যুদ্ধের আগের কথা বলছি—অর্থাৎ 'ব্ল্যাক মার্কেট' কথাটা তখন অভিধানেও ছিল না। সুরেশ্বর বলল, "ব্যবসা করব, কিন্তু সাধারণ ব্যবসা নয়। আমার ব্যবসায়ে দাঁড়িপাল্লা করতে না। আমি কারবার করব লোকের মনের খোরাক নিয়ে। লাভ? হয়তো অর্থের দিক দিয়ে তেমন হবে না, কিন্তু দেশের শিক্ষিত সমাজের তৃপ্তিসাধন, সেটাই কি কম লাভ? তারই জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করব।"

তাই হ'ল। সুরেশ্বর এক পত্রিকা বের ক'রে ফেলল—'গুঞ্জন'।

গুঞ্জনকে ঘিরে বাংলায় লিখিয়ে মধুকরের দল গুঞ্জন সুরু করলেন। সুরেশ্বর গুঞ্জনের জন্য জীবন না হোক, অবসর ও অর্থ দু'হাতে উৎসর্গ করতে লাগল। কাগজ দাঁড়িয়ে গেল। অর্থাৎ বাংলাদেশের শতকরা নিরেনব্বইখানা কাগজের মত বছরের প্রথম দিকে ৩।৪ মাস বেরিয়ে ছাপাখানার পাওনা মেটাতে অক্ষম হয়ে প্রেতলোকে মহাপ্রস্থান করল না।

সুরেশ্বরের বাড়ীর নীচেকার তলায়ই তার আপিস। সকালে সেখানে বসেই সে লেখে, দুপুরে সেখানে বসেই সম্পাদকীয় কাজকর্ম

করে. এবং সন্ধ্যার পর সেখানে বসেই সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে চা ও ডালমুট সহযোগে সাহিত্য-মজলিস বসায়। রবিবার আপিস বন্ধ, কিন্তু বৈকালিক সম্মেলন সমান ভাবেই চলে। নাম-করা লেখকদের হাতে রাখবারও নাকি একটা সম্পাদকীয় কৌশল। সকালেও স্থরেশ্বর যেখানেই বসে। কাজের বিরাম নেই। কবিতা লেখা চুলোয় গেছে। সম্পাদকের ও সব বিলাসের সময় কই?

সেদিনও এমনি ধারা এক রবিবার। শীত শেষ হয়ে সবে বাসন্তী হাওয়া বইতে শুরু করেছে। স্থরেশ্বর আপিস-ঘরে টেবিলের সামনে বসে ঘন ঘন চায়ে চুমুক দিচ্ছে আর খস খস ক'রে ঝর্ণা-কলম বাঁধানো প্যাডের পাতায় ওঠা-নামা করছে। এ মাসের কাগজ বেরুতে আর মাত্র তিন দিন বাকি, কিন্তু সম্পাদকীয়টা আলসেমি করে এখনও লেখা হয়নি। আজ শেষ না করলেই নয়। সহকারী সম্পাদক মনোহরবাবু আজ তিন দিন থেকে সমানে তাড়া দিচ্ছেন। এ বেলা শেষ করতেই হবে। মহেন্দ্রবাবুর ক্রমশঃ উপন্যাসের এ মাসের কিস্তি এখনও পাওয়া যায়নি। ক'দিন থেকে রোজ লোক গিয়ে গিয়ে ফিরে আসছে। আজ সে নিজেই যাবে। লেখকেরা একটু নাম কিনলেই যা পায়া ভারী হয় তাদের। ছ'দিন আগে যারা সম্পাদকের কাছে ছ'বেলা হাঁটাহাঁটি করে পায়ে কড়া বাধিয়ে বসত, ছ'দিন বাদে তারাই হয় যেন আর এক মানুষ। নেহাৎ লোকে পছন্দ করে, নইলে—

হঠাৎ দরজায় কার ছায়া পড়ল। একটি বছর ২২।২৩-এর যুবক দরজার পাশে দাঁড়িয়ে স্মিত হাস্যে প্রশ্ন করল, "আস্তে পারি স্যর?"

স্থরেশ কলম থামিয়ে ইঙ্গিতে সম্মতি জানাল। উপায় কি? অভদ্র হওয়া যায় না তো!

যুবক ঘরে ঢুকে তেমনি মোলায়েম হেসে বলল, "আমাকে হয়তো চিনবেন না স্যর, কিন্তু আমার দাদামশায়কে নিশ্চয় চিনবেন—ঈস্সর বটকেস্ট বিশ্বাস।" যুবক বোধ হয় আধুনিক বানানের মত উচ্চারণটাও সহজ করতে চায়। ইংরিজি S-এর অনুকরণে শ, ষ, স-এর

মধ্যে শেষেরটিকেই তার পছন্দ।

সুরেশ্বর করুণ ভাবে জানাল, ও নাম তার শোনার সৌভাগ্য হয়নি। যুবক একটু বিস্মিত হয়ে বলল, "শোনেন নি! সেই যে যিনি সুশীলগঞ্জে একটা গোল্‌ড-মাইন্ ইন্‌ভেনশন্ করেছিলেন ?— বটকেস্ট বিশ্বাস ?"

সুরেশ্বর আর ঘাঁটাতে ইচ্ছা করল না, সংক্ষেপে বলল, "ও"!

যুবক সাহস পেয়ে বললে, "আমার নাম গুণসিন্ধু বিশ্বাস, সাহিত্য-সৌরভ।" তারপর ফিস ফিস ক'রে বলল, "আপনি গুণী লোক, বয়োজ্যেষ্ঠ, আপনাকে লুকোবো না। ছেলেবেলায় ভারী আমাসা হওয়ায় বেশি পড়াশোনা হয়নি। কিন্তু নামের পাশে একটা উপাধি না থাকলে নেড়া নেড়া ঠেকে, তাই ভালা বিজ্ঞান পরিষদে কয়েকটা টাকা মনি অর্ডার করে 'সাহিত্য-সৌরভ' উপাধিটা আনিয়ে নিয়েছি। কাউকে বলবেন না যেন স্যার।"

সুরেশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

"ছেলেবেলা থেকেই, স্যর, আমার পদ্য লেখার বড় সখ"— গুণসিন্ধু পকেট থেকে এক তাড়া কাগজ টেনে বার করল।—"আপনাকে স্যর, একটু শুনতে হবে।"

সুরেশ্বর প্রমাদ গণল, কিন্তু এ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। ম্লান হেসে বলল, "আচ্ছা, রেখে যান, পড়ে দেখব।"

"না স্যর, আমি পড়িয়ে শোনাচ্ছি। যুৎসই করে পড়তে না পারলে রসগ্রহণে ব্যাঘাত হবে। দশ মিনিট সময় আমাকে দিন— মাত্র দশ মিনিট।" এবার সুরেশ্বরের অনুমতির অপেক্ষা না করেই গুণসিন্ধু করল—

"দীর্ঘ দিন—আরো দীর্ঘ রাত
আছি বসে বটের কোটরে।
ঘাসের ডগায় ঝলে মাকরের জাল,
সাথে তার ক্ষুদে ক্ষুদে ডিম।

লোভাতুর টিকটিকি দূরে চেয়ে রয়,
মনে হয়—"

পড়তে পড়তে গুণসিন্ধুর কপাল কখনও বা কুঞ্চিত হ'ল, নয়ন বিস্ফারিত হ'ল, গলার স্বর ধাপে ধাপে চড়তে লাগল, আবার নামতে লাগল।

সুরেশ্বর কলম কামড়ে ধরে বসে রইল। ঝাড়া আধ ঘণ্টা পরে গুণসিন্ধু থামল। মুখে তার আত্মপ্রসাদের হাসি। বললে, "এ মাসের গুঞ্জনে কিন্তু আমার অন্ততঃ দু'টো লেখা দিতে হবে স্যর।"

"এ মাসে! এ মাসের লেখা তো দু'মাস আগেই ঠিক হয়ে আছে। তা ছাড়া—"

"ও সব শুনছি না স্যর! দিতেই হবে। আপনি বায়োজ্যেষ্ঠ, তায় 'লিটারেট' লোক। এ লাইনেই করে খাচ্ছেন। উৎসাহ না দিলে চলবে কেন?" গুণসিন্ধু আর একবার মোলায়েম ভাবে হাসল। সুরেশ্বর বাক্যব্যয় বৃথা বুঝে বললে, "আচ্ছা, রেখে যান।"

'রেখে যান' কথাটিও একটি সম্পাদকীয় ভদ্রতা, অনেক বিপদ থেকে সুরেশ্বরকে রক্ষা করেছে।

গুণসিন্ধু চলে গেলে সুরেশ্বর মনোহরবাবুকে ডাকল।—"এই নিন আর দু'টি কবিতা। এ মাসে এই নিয়ে ক'টি হ'ল? মনোহর বাবু একটু ভেবে বললেন, 'আটশ' পুরে গেছে বোধ হয়। আর তিন দিন মাস কাবারের আছে, হাজার হয়ে যাবে। তা যাক্, সব এক পিঠে লিখা, উল্টো দিকে আপিসের রাফ্ কাজকর্ম করা চলবে। সাদা কাগজের যা দাম আজকাল!'

মনোহরবাবু পাশের ঘরে ঢুকলেন, সুরেশ্বর আবার কলম নিয়ে কাগজের ওপর মনোযোগ দিল। আবার ঘরের দরজা ফাঁক হয়ে গেল। এবারে যিনি ঢুকলেন তিনি আগের মত বিনীত ন'ন, বয়সেও অনেকটা বড়। সটান ভিতরে এসে বললেন, "গুঞ্জনের সম্পাদক কে? আপনি?"

সুরেশ্বর থতমত খেয়ে চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ"।

ভদ্রলোক যেন খেঁকিয়ে উঠলেন। পকেট থেকে লম্বা একটা কাগজ বের করে বললেন, "হুঁ। আচ্ছা মশাই, জানতে পারি এ লেখাটি ফেরৎ দিয়েছেন কেন? আর—আর এই লেখা—" ভদ্রলোক ফস্ করে বগলের তলা থেকে একখানা পুরোনো গুঞ্জন বের ক'রে বললেন, "এটি আপনার কাছে খুব ভাল লেগেছে না? কেন না উনি, শ্রীঅনিন্দ্য রায়, ২।৪টে ট্রাশ বই ছেপে বাজারে একটু নাম ছড়িয়েছেন, কেমন, এই না?"

সুরেশ্বর দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দেখল সামনে একটি সুদীর্ঘ রচনা। লেখকের নামের জায়গায় মোটা মোটা অক্ষরে লেখা শ্রীক্ষেমাঙ্করী দাসী ওপর রবার ষ্ট্যাম্পে গুঞ্জন কার্যালয়ের ছাপ দেওয়া। তার নীচে আর একটি ছাপ—'অমনোনীত' নীচে তার নামের আদ্যাক্ষর 'সু'।

"লেখা পত্রিকার উপযোগী কিনা সেটা সম্পাদকের মতামতের ওপর নির্ভর করে। তার জন্য যদি সবাইকে কৈফিয়ৎ দিতে হয় তো আর—"সুরেশ্বর কথাটা আর শেষ করতে পারল না, ভদ্রলোক কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, "থামুন মশাই, থামুন। লেখার ভাল-মন্দ আমরাও কিছু কিছু বুঝি। সম্পাদকী করি না বলে একেবারে ঘাসও খাই না। সব আপনাদের পক্ষপাতিত্ব, নইলে—"

সুরেশ্বর তর্ক না ক'রে নিজের লেখার দিকে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করল। ভদ্রলোক ব'লে যেতে লাগলেন, "শুনুন তবে। ওটি আমার স্ত্রীর লেখা। ভেবেছিলাম মেয়েছেলে, একটু উৎসাহ পাবে। ওদিকে কাগজে তো খুব লম্বা-চওড়া লেখেন—মেয়েদের তুলতে হবে, পড়াতে হবে, হেন করতে হবে, তেন করতে হবে—কত কি! তা যাক্, এবার দেখা যাবে ক'দিন কাগজ চাল'ন!" ভদ্রলোক দরজার কাছে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়ালেন, বললেন, "হ্যাঁ, আমার স্ত্রী আপনাদের গ্রাহিকা ছিলেন। নাম কেটে দেবেন। ও রকম ওঁচা কাগজ বাড়ীতে যাওয়া আমি পছন্দ করি না।"

সুরেশ্বর কি জবাব দিতে গেল, কিন্তু ভদ্রলোক তার আগেই গেছেন। সুরেশ্বরের মনটা খিঁচড়ে গেল! চায়ের ঝোঁকটা থাকতে থাকতে বেশ দরদ দিয়ে সে স্ত্রীশিক্ষার ওপরই এক কলম লিখতে যাচ্ছিল যে।

মিনিট দুই মাত্র! দরজা আবার ফাঁক হ'ল। একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক বছর দশেকের গোলগাল, টোপাটোপা একটি মেয়ের হাত ধরে ঘরে ঢুকলেন।

"আপনার নামই সুরেশ্বরবাবু? নমস্কার।"

"নমস্কার।"

"এলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করতে। এটি আমার মেয়ে টেঁপী—মানে অলকনন্দা চ্যাটার্জী।" মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "নমস্কার করেছিস?" প্রত্যুত্তরে টেঁপী—মানে অলকনন্দা চ্যাটার্জী ড্যাব ড্যাব চোখে সুরেশ্বরের দিকে তাকিয়ে রইল, মুখে, কোন ভাবান্তর দেখা গেল না!

প্রৌঢ় ভদ্রলোক কিন্তু দমলেন না। বললেন, নিজের মেয়ে, নিজের মুখে বলাটা ভাল দেখায় না। কিন্তু অদ্ভুত প্রতিভা মশাই, বললে বিশ্বাস করবেন না—

বিশ্বাস করবার জন্য সুরেশ্বর প্রতিভাময়ীটির দিকে ফিরে তাকাল। বেশ কুমড়ো কুমড়ো চেহারা! প্রতিভার কোন ছাপ মুখে অন্ততঃ নেই।

"বের কর তো টেঁপী— মানে অলকনন্দা, সেই ছবিটা। দেখুন মশাই, এইটুকু মেয়ে, নি-ঈজে এঁকেছে। বিশ্বাস করেন?" ভদ্রলোক সুরেশ্বরের সামনে একটি ভাঁজ করা কাগজ মেলে ধরলেন। সুরেশ্বর বিস্মিত হয়ে দেখল এবং সেটা টেঁপী অর্থাৎ অলকনন্দার নি-ঈজের আঁকা তাও বিশ্বাস করল। ছবির নিচে টেঁপী—অর্থাৎ অলকনন্দার মতই গোদা গোদা অক্ষরে লেখা 'ধানের আঁটি। (ছবিখানা দেখলে হয়তো তলায় 'আমের আঁটি বা গাবের আঁটি লিখে দিতেই

সাধ যাবে।) আরও নীচে অশুদ্ধ বানানে শিল্পীর নাম টেঁপী লিখে কেটে শ্রীমতি অলকানন্দা চ্যাটার্জী বসানো হয়েছে। ছবির বিষয়-বস্তু এই রকম: প্রকাণ্ড একটি মেয়ে—শরীরের দ্বিগুণ, পটল চেরা নয়, একেবারে ঝিঙে-চেরা চোখ নিয়ে এক হাঁটু ব্লু ব্ল্যাক কালির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। হাতের আঙুলগুলো সব ঠুঁটো। হাত ও আঙ্গুল দুই-ই খাড়া ওপর দিকে উঠে আছে। তার ওপর ইকড়িমিকড়ি কুণ্ডলী পাকানো সাপের মত কতগুলো যেন কি! সেগুলিই সম্ভবতঃ ধানের (বা আমের) আঁটি। ছবির পেছনে আকাশের গায়ে বেশ বিরাট আকারের একটি গোল সূর্য। কম্পাস দিয়ে এমনভাবে গোল করা হয়েছে যে কম্পাসের কাঁটায় কাগজ ফুটো হয়ে গেছে। তার কিছু পেছনে আধখানা কামড়ানো লুচির মত এক ফালি চাঁদই হবে বোধ হয়! এবং তারও পেছনে কয়েকটি উড়ন্ত পাখি বা মশা বা ঐ রকম কিছু একটা!

"এটি কিন্তু মশাই; আপনার কাগজে বের করা চাই। এ মাসেই। জানেন তো, সুযোগ না দিলে প্রতিভারও অমমৃত্যু হয়। ফুল মেনি এ জেম্ অব পিওরেস্ট রে সিরীন—পড়েছেন তো?"—টেঁপীর বাবা বললেন।

সুরেশ্বরের ইচ্ছা করছিল, এখনই গলা টিপে একসঙ্গে প্রতিভা ও সেই প্রতিভার পিতৃদেবের শুদ্ধু অপমৃত্যুর ব্যবস্থা করে দেয়—ভবিষ্যতের জন্য ফেলে না রেখে। কিন্তু বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করে, কাষ্ঠহাসি হেসে, সে শুধু বললে, "আচ্ছা রেখে যান।"

ক্রিং—ক্রিং-ং-ং-ং। সুরেশ্বর টেলিফোনটা কানে চেপে বলল, "হ্যালো! হ্যাঁ, গুঞ্জন অফিস। স্পিকিং। কিন্তু আজ আপিস বন্ধ কাল বরঞ্চ—হ্যাঁ? না, ধারাবাহিক উপন্যাসের জায়গা নেই। তবু—কি বলছেন? জোরে বলুন। একটা অভিমত? কি দরকার? আচ্ছা, না না, আজ আসবেন না, উইক্ ডে-তে একদিন পাঠিয়ে দেবেন। হুঁ, নমস্কার! খটাং করে রিসিভারটা স্বস্থানে রাখতেই

আবার সামনের দরজা খুলে গেল।

তারপর পর পর সতেরো জন।

সুরেশ্বর দরজা বন্ধ করে ওপরে চলে গেল। সারা সকালটাই মাটি। ওপরে গিয়ে, ভাইপো-ভাইঝিদের চীৎকার অগ্রাহ্য করেই সে আর একবার লেখাটা নিয়ে বসবার চেষ্টা করবে।

কিন্তু হায় রে, ওপরে আসতে না আসতে চাকর ছক্কুলাল এসে জানাল, "একটা বাবু আইসেছে। আপনাকে বোলাইছে।"

সুরেশ্বর তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল, বলল, "বল্ গিয়ে বাবু মরে গেছে।"

ছক্কুলাল ঘাড় নেড়ে বললে, 'জী!'

সে সত্যি সত্যি চলে যায় দেখে সুরেশ্বর তাকে ডেকে ফেরাল। বললে, "এই শোন কি বলবি?"

ছক্কুলাল বোকা হাসি হেসে বলল, "বলবে, বাবু বলিয়েছেন তিনি মরিয়ে গেছেন।"

"দূর গাধা! আচ্ছা শোন। কোন বাবু? কি রকম দেখতে?"

ছক্কুলাল হাতের তেলো মাটির ওপর সমান্তরালভাবে ধরে উচ্চতা দেখিয়ে বলল, "এই এত্তো বোড়ো।"

"দূর হাঁদা! কত বয়স হবে?"

"এই এক কুড়ি দু কুড়ি হবে।"

সুরেশ্বর আর কথা না বাড়িয়ে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে নীচে নেমে এল।

ফাল্গুনের গুঞ্জন বেরিয়ে গেছে। ২।৪ দিনের জন্য একটু নিঃশ্বাস ফেলা যাবে। বাবাঃ, একেই বলে সাহিত্যসেবা! মনের খোরাক নিয়ে কারবার এরই নাম? সুরেশ্বর ভাবতে পারেনি, অতি সাধের কাজও অবশ্যকর্তব্য হলে বিরক্তিকর হতে পারে। সুরেশ্বর ঠিক করল কয়েক দিনের জন্য দার্জিলিং ঘুরে আসবে। কলকাতায় থাকলে নিশ্চয়ই সে হার্টফেল করবে।

দার্জিলিং। লুই জুবিলী স্যানিটেরিয়াম। দলে দলে স্বাস্থ্য ও আমোদপিয়াসীর ভীড়। নিজের গায়ে ওভারকোট এবং কুলীর মাথায় মোট চাপিয়ে সুরেশ্বর ম্যানেজারের ঘরে এসে হাজির হল। "একটা সিংগল্-সিটেড ঘর চাই স্যার!" ম্যানেজার অবাক হয়ে বল্লেন "সিংগল্-সিটেড ঘর। এই ভীড়ে? ক্ষেপেছেন? ডবল্-সিটেড ঘরও একখানা খালি নেই। তবে—আচ্ছা দাঁড়ান। একখানা বোধ হয় ডবল-সিটেড ঘর আছে। সেখানকার একজন বোর্ডার কাল চলে গেছেন। মিস্টার ভড় একা আছেন। তা সেখানে প্রায় সিংগল-সিটেড ঘরের মতই আরাম পাবেন। মিস্টার ভড় বয়স্ক লোক, আর অতি সজ্জন।"

অগত্যা সুরেশ্বর তাতেই রাজী হল। উপায় কি?

মিস্টার ভড় অর্থাৎ গোবর্ধন ভড় সওদাগরী আপিসে চাকরি করেন। বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। মুখে সর্বদাই হাসি লেগে আছে। সুরেশ্বরকে তিনি খুব খাতির করে গ্রহণ করলেন!

"কদ্দিন আছেন? এক সপ্তাহে কি হবে মশাই! থেকে যান, থেকে যান। এখন মেওয়া সস্তা, কপি আর কড়াইশুটি এন্তার। ও জিনিস এখন প্লেনে কোথায় পাচ্ছেন? তারপর জানলা খুললেই নগাধিরাজ—"

একটু পরে আবার প্রশ্ন করলেন, "কি করা হয়?

"এই একটু কাগজ দেখাশোনা করি।"

কাগজ! কাগজের দোকান আছে বুঝি? তবে তো রাজা লোক! উঃ কি দামটাই বেড়েছে কাজজের!"

"সে কাগজ নয়, মাসিক কাগজ—গুঞ্জন।"

"গুঞ্জন? মাসিক পত্র? আপনি এডিটার বুঝি?' গোবর্ধন-বাবুর মুখে এবার সম্ভ্রমের চিহ্ন ফুটে উঠল।

সারাদিন টৈ-টৈ করে ট্রেনের ঝাঁকুনিতে ক্লান্ত সুরেশ্বর সন্ধ্যার পর তাড়াতাড়ি খেয়ে নেবে ভেবেছিল, কিন্তু এখানে সবই টাইম

বাঁধা খাবার ঘণ্টা পড়ল তবে খাবার আসবে। ঘণ্টা দুই তীর্থের কাকের মত বসে থাকবার পর ইস্কুলের ছুটির ঘণ্টার মত মধুর ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল। অমনি একসঙ্গে ঘরে, বারান্দায়, উঠোনে চটি, স্যাণ্ডাল এবং ভারী জুতোর প্রবল শব্দে বোঝা গেল দার্জিলিংএ খিদেটা বোধ হয় ভালই হয়।

টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। প্রচুর ঠাণ্ডা। এবারে ঘুমটাও যুৎসই হবে। সুরেশ্বর মনে মনে ভাবল—দার্জিলিং-এর এই তো মজা।

সবে তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় গোবর্ধনবাবু ডাকলেন, "মশাই, ও মশাই শুনছেন? বলি ও এডিটারবাবু!"

সুরেশ্বর ধড়মড় করে উঠে বসল,—"কি! কি! কি ব্যাপার?"

"না, কিছু নয়। আপনাকে একটা জিনিস শোনাব। এখনই ঘুমুবেন কি? এখানে কি ঘুমুতে আসে?" গোবর্ধনবাবু স্যুটকেস খুলে একখানা মোটা খাতা বার করলেন। একটু যেন সলজ্জভাবে বললেন, অনেক দিন থেকে একটু-আধটু নাটক লিখে আসছি, ছাপানো দূরে থাক, কাউকে শোনাতেই পারি না। আজ এতদিন পরে যোগ্য লোক পেয়েছি। একটু শোনাতেই হবে। বেশী নয়, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই হয়ে যাবে।"

"অ্যাঁ—এখন?"

"না না, ওজর চলবে না। আপনি জহুরী, আপনার মতের একটা মূল্য আছে—শুনতেই হবে। না না, শুয়ে শুয়ে হয় না, উঠে বসুন।" সুরেশ্বরকে আর প্রতিবাদের সময় না দিয়ে গোবর্ধনবাবু আরম্ভ করলেন:

"জাঁহাপনা।"

"কী সংবাদ দূত? অসঙ্কোচে কর নিবেদন।"

সুরেশ্বর ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল! গোবর্ধনবাবু অভিনয়ের ভঙ্গীতে পড়ে চললেন। তিনি শুধু নাট্যকার নন, নটও।

বাইরে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। কনকনে হাওয়া জানলার

ফুটো দিয়ে সূচের মত মুখে-চোখে বিঁধছে। এই ভাবে চলল পাক্কা তিন ঘণ্টা। শেষে গোবর্ধনবাবু থামলেন। "এটা ঐতিহাসিক, কাল একটা পৌরাণিক নাটক শোনাব—জরাসন্ধ বধ। সামাজিকও আছে, তা পরে হবে। সবশুদ্ধ চোদ্দখানা লিখেছি ; ঐ চৌদ্দ দিনের আগে কিন্তু আপনাকে ছাড়ছি না।"

সে রাতে সুরেশ্বরের ঘুম হল না। পরদিন শোনা গেল, ভোর হবার আগেই সে কখন ম্যানেজারকে জাগিয়ে, হিসেব চুকিয়ে, এক ভুটিয়া কুলির মাথায় মোট চাপিয়ে চলে গেছে। স্টেশনের দিকে নয়,—সোজা উত্তরে, বোধ হয় তিব্বতের পথে। বিশ্রাম তার চাই-ই।

———

ব্যাপারটা হাসির

আশা দেবী

ঝণ্টু বললে : সদা হাস্যমুখে থাকবি, বুঝলি। আমি খবরের কাগজের পাতাগুলো উল্টে উল্টে দেখছিলাম মশাগ্রামের রাস্তাঘাটের কি কি উন্নতি হয়েছে। ঝণ্টুর কথাটা কানে যেতেই বলে উঠলাম : সব সময় হাসবো। লোকে তো পাগল বলবে! সব সময় কি হাসা সম্ভব?

হ্যাঁ, যায় বৈকি ঝণ্টু গম্ভীর হয়ে বললে : তবে হাসতে পারাও তো একটা যোগ্যতার কথা! সে যোগ্যতা থাকেই বা ক'জনের বল?—ওই যে তোর কেলোপিসে ময়লা মাছের থলে নিয়ে বাজারে যান, তার মুখের দিকে তাকালে তো বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। কানে থোপা থোপা চুল আঙ্গুরের থোকার মত ঝুলছে—। সেই কর্ণাটকেশরী পিসের মুখখানা যেন একেবারে ভুষুণ্ডির মাঠের ওল। যদি একবার মুখ খুলেছে তবে আর রক্ষে নেই তার চিৎকারের চোটে। তাই বলছি যদি হাসিমুখ দেখতে চাস তবে কাল চল আমার সঙ্গে একটা মশারী কিনে মশাগ্রামে। কাকে বলে সদা হাস্যমুখে থাকা। —তুই কখনও গেছিস সেখানে? আমি বললাম,—না যাই নি। কখনও। তবে সবাই বলে; হ্যাঁ, মামা বটে একখানা ঝণ্টের। যাকে বলে মামার মত মামা। লোক দেখলেই হেসে কুটিপাটি— কুকুর দেখলেই খিলখিলিয়ে হাসি—কে যেন একদিন তাকে বলেছিল তার ছেলেটা মরে-মরে—শুনে হাসিতে লুটিয়ে পড়ে মামা বলেছিলেন : তা বেশ—তা বেশ। ই-হি-হি। হেসে আর বাঁচি না।

—ও বাবা পাগল-টাগল নয় তো!

চটে গিয়ে ঝণ্টু বললেঃ জানিস হেবো, এ তুনিয়ার সংসারে যারা ভাল হয় তাদেরই লোকে পাগল বলে। বলবেই। আমার মামা বেশী ভাল লোক কি না তাই পাগল। চল না একবার মশা-গ্রামে—গিয়ে আর তোর ফিরতে ইচ্ছা করবে না একেবারে। আর আমিও তো কখনও যাইনি। মামারও আমি ছাড়া কেউ নেই। একবার গিয়ে দেখলে হয়। লোকে কথায় বলেঃ "মামার বাড়ীর আদর।" তা একবার মামার বাড়ীর আদর পেয়ে এলে, মন্দ হয় না। চল, কাল সকালে 'তুর্গা' বলে রওনা হয়ে যাই।

আমিও ভাবলাম। গেলে মন্দ হয় না একবার। সাঁওতালদিতে যেমন সাঁওতাল নেই'—মশাগ্রামেও হয়তো তেমনই মশা নেই। কু-লোকে রেগে-টেগে হয়তো ওর অমন বাজে একটা নাম দিয়েছে; গিয়ে ভাল লাগবে।'

সুতরাং, সকালেই তুর্গা নাম করে বেরিয়ে পড়লাম ঝণ্টুর সঙ্গে।

স্টেশনে যখন নামলাম তখন প্রায় তুপুর হয় হয়। ভীষণ গরম পড়েছে। গরমে যেন মাটি ফেলে যাবে চারিদিকে। আমরা নামতে দেখি কুলিরা এসে মালপত্র খোঁজাখুঁজি করছে। আমাদের তু'জনের হাতে তু'টো টিনের সুটকেশ। আমাদের আর কুলির কি দরকার ঝণ্টে বললেঃ মামার কাছে খবর পাঠিয়েছি। মামা নিশ্চয়ই স্টেশনে আসবেন, কারণ আমরা তো বাসা-টাসা ওঁর চিনি না। তিনি নিশ্চয়ই আমাদের নিতে আসবেন।

আর এসেছেনও।

আমাদের দেখে তিনি হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এলেন।

মাথার ওপর প্রচণ্ড সূর্য্যের তাপ আগুন ছড়াচ্ছে। একটু হাওয়া নেই। একটা গাছের পাতা নড়ছে না। গাছের ডালে ডালে কাকগুলো হাঁ করে বসে আছে। চড়ুইগুলো স্টেশন-মাষ্টারের খাতা-বই-এর ভেতর থেকে পোকা ধরে ধরে খাবার চেষ্টা করছে।

রাস্তার কুকুরগুলো জিভ বের করে ধুঁকছে।

আমি বললাম : ঝণ্টে চল তাড়াতাড়ি, নইলে একটা গাড়ী ফাড়ি কর। যা রোদ, মাথা পুড়ে যাবে।

—সত্যি। ঝণ্টু বললে, মামার বাড়ী কতদূর? যদি কাছে হয় তবে চল, আর যদি দূর হয় তবে একটা গাড়ি-ফাড়ি কর। এত পথ হাঁটতে পারবো না।

মামা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে এগিয়ে চললেন। আমি বললাম : না-রে হেবো দূর নয়। চল একটু কষ্ট করে, হেঁটেই যাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে।

আমরা এগিয়ে চলতে লাগলাম। রাস্তা ভীষণ গরম হয়ে উঠেছে। পিচ্ যেন গলে যাচ্ছে গরমে। আমরা দু'জনে প্রথমে বেশ হন্ হন্ করেই চলছিলাম। ক্রমে ক্রমে আমাদের গতি কমে আসতে লাগছে। গরম রাস্তার ওপরে পা দেব কি ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে যেন গরমে পা-পুড়ে যাচ্ছে! মনে হচ্ছে যেন আমরা গরম চাটুর ওপব পা রাখছি, এ রাস্তা নয়।

এবার দাঁড়িয়ে পড়লাম আমরা।

—মামা আর তো পারি না। এবার সাইকেল রিক্সা টিক্সা কিছু কর।

মামাকে বেশ ভালই লাগলো। তিনি কি যেন উত্তর দিলেন। মনে আশা হলো হয়তো মামা এবার একটা সাইকেল রিক্সা করে ফেলবেন। কিন্তু কোথায় কি 'কাকস্য পরিবেদনা।' মানে কাখ এবং অশ্ব পড়ে পড়ে বেদনা খেতে লাগলো। যিনি এ কথা বলেছিলেন তিনি ঝণ্টু এবং হোবেকে কাক এবং অশ্ব ভেবে এ কথা বলেছিলেন কিনা কে জানে। কিন্তু ঝণ্ট, আর হোবোর যা অবস্থা তাতে বেদনা খেতে আর বাকি কি?

আমি বললাম : কি রে ঝণ্টে, কত কথা বলে আমায় নিয়ে এলি : —তোর মামা খুব দয়ালু - কৃপালু আর কি বলে ওই শাঁকালু, এখন

দেখছি একেবারে গোলালু। এতক্ষণ ধরে এসেছি—কত কথা বলছি সেই মারাত্মক হাসি আর মুরগীর মত কোঁকর-কোঁ ছাড়া কোন আওয়াজই তো শুনলাম না। আর চলেছেন তো চলেছেনই যেন মহাপ্রস্থানের পথে। এর না আছে এদিক না আছে ওদিক। আর তো পারি না—মাথা পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে গেল। পায়ের কথা আর কী বলবো, পায়ের যে অবস্থা মনে হচ্ছে ও পা আমার নয় অন্য কারুর। বলেই আমি লাফাতে লাগলাম; একেবারে যাকে বলে: 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে তা তা থৈ-থৈ, তা-তা-থৈ-থৈ নাচ।

ঝণ্টু আবার রোগা সিট্‌কে। সে যেন জালের ভেতর চিংড়ি মাছের মত ছলা-ছলা নাচ শুরু করে দিল। এ পা নামায় তো ও পা ওঠায়। কিন্তু মামা—কার সাধ্য রোখে তার গতি,—সে প্রায় ছুটে চলতে লাগলো কোন দিকে না তাকিয়ে।

আমি বললাম: মামা একটু জল। প্রাণ গেল।

ঝণ্টু বললে: মামা দাঁড়াও, দৌড়িও না, তেষ্টায় যেন বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে—।

কিন্তু মামা না দাঁড়ায়, না পিছু ফিরে চায়। আমরা দু'জনে এবার ছুটতে লাগলাম। মামা একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে কোঁকর-কোঁ করেই ছুটতে লাগলো।

আমরা বুঝলাম বেগতিক! মামা তেড়াবেঁকা পথ ধরে যে ভাবে ছুটছে তাতে যদি এই জঙ্গলের পথ ধরে কোনদিকে চলে যান, আমরা একেবারে এখানে নতুন, কিছুতেই চিনে বের করতে পারব না। কাজেই মামার পিছু একেবারেই ছাড়া চলবে না। সঙ্গে যেতেই হবে।

বেশ খানিকটা গিয়ে গরমে ক্লান্তিতে আমি প্রায় অজ্ঞানের মত হয়ে যখন পড়েছি তখন মামার বাড়ীর বারান্দায় গিয়ে পৌঁছালাম আমরা।

এবং অস্ফুট স্বরে বললাম ঃ জল। প্রাণ যায়।

মামা ঘরে গিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগলেন। কোন কথা বললেন না।

ঝণ্টু ছুটে ঘরে গিয়ে দেখলে মামা থালায় মিষ্টি সাজাচ্ছে যেন কি কি—নিপুণ হয়ে।

আমি আর ভাবলাম না, বারান্দায় বালতি থেকে এক ঘটি জল ঢক ঢক করে খেয়ে, বাকী জলটা মামার মাথায় ঢেলে দিলাম।

ঝণ্টু বললে ঃ কর কি! কর কি!

আমি বললাম ঃ বেশ করি। যা করা অনেক আগেই উচিত ছিল তাই করেছি তোর তো মামা নয় ডাকাত। মানুষ খুনো আর হাসি না হাসি—এর মেন গলার ফাঁসি।

বালতি থেকে খানিকটা জল ঢক ঢক করে খেয়ে মামা বললে ঃ তা বেশ—

এতক্ষণে বোঝা গেলো তাঁরও প্রাণ যাচ্ছিল তেষ্টায়।

—তা বেশ।—ঝণ্টে আয়, আমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকবো না। মামার হাসিমুখের অভ্যর্থনার যদি এই নমুনা হয় তবে বাকী আর যে কী আমাদের কপালে আছে তা সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে। পালিয়ে আয়।

ঝণ্টু অনেকক্ষণ ধরে কি যেন লক্ষ্য করছিল মামার দিকে তাকিয়ে, আমার দিকে চোখ পড়তেই বললে ঃ হেবো সুটকেশ ফেলে চলে চল। আর থাকা নয়; বলতে বলতেই মামা একেবারে হাসতে হাসতে এক হাঁড়ি পচা গোবর জল ঝণ্টের মাথায় ঢেলে দিলে। আর বাকীটা নিয়ে আমার দিকে হেসে হেসে ছুটে আসতে লাগলো। আমি দেখলাম মামার ঘরে যত আবর্জনা, ছেঁড়া জুতো, গোবর গোলা হাঁড়ি হাঁড়ি জল, পচা মাতুর আর কত কি তাঁর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস—সারাদিন আস্তাকুঁড়ের সংগ্রহ। এবার ঝণ্টেকে ছেড়ে উনি হেসে হেসে পায়ের বেড়ী বাজিয়ে আমার দিকে ছুটে আসছে

লাগলেন।

পাশের ঘর থেকে কে ভদ্রলোক বেরিয়ে বললে : পালাও,—বদ্ধ পাগল! উনি পনের দিন ভাল থাকেন, পনের দিন উন্মাদ হয়ে ওঠেন। পালাও—পালাও, আর রক্ষে নেই। আমরা দুজনেই স্টেশনের দিকে ছুটতে লাগলাম। আর পেছন থেকে সামনে মামার হাসির আওয়াজ ভেসে আসতে লাগলো—ও-হো-হো—পেট গেল হাসিতে। ই-হি-হি-হি—কি মজার কথা। জল তেষ্টা-হি-হি। জলে বড় পোকা কেটা বড় বোকা—। ই-হি-হি-হি কি হাসির কথা।

উলটো বিচার

স্নমথনাথ ঘোষ

অনেক অনেক আগের কথা তখন এ দেশের এক আশ্চর্য রাজা ছিলেন।

যেমনি তার নিয়ম, তেমনি তার বিচার। সবাই তাকে বলতো আজব রাজা।

আজব কাণ্ড, সব যেন উল্টো, সবাই বলে রাজার মত খেয়ালী আর এদেশে নেই।

প্রজারা তাতে ভয় খেত আবার মজাও পেত।

সেই আজব রাজার গল্প তোমাদের বলছি।

এ রাজ্যের সবই উল্টো।

যেমন ভণ্ড রাজা, তেমনি শঠ ও প্রতারক তার মন্ত্রী ও পারিষদ-বৃন্দ। প্রজা পালনের নামে রাজা করেন প্রজা শোষণ।

ধর্মদণ্ড হাতে থাকলেও অধর্মের সাহায্যে তিনি রাজকার্য পরিচালনা করেন।

তাই যারা অন্যায় করে তারা এখানে শাস্তি পায় না, যারা ন্যায়ের পথে চলে তারাই দণ্ড ভোগ করে।

ন্যায়নিষ্ঠ ধার্মিক প্রজারা সব সময় আতঙ্কে কাঁটা হয়ে থাকে।

কি জানি কার ওপর কখন রাজ অনুগ্রহ বর্ষিত হয়।

রাজার চেয়ে ভয় করে সবাই বেশী তাঁর অনুচরবর্গকে।

তারা সব সময় পরের ছিদ্র অন্বেষণ করে বেড়ায়। কার ক্ষেতে ধান জন্মেছে বেশী, কার পুকুরে মাছ হয়েছে অঢেল, কার ব্যবসায়ের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে গোপনে তার তথ্য সংগ্রহ।

তারপর চুরি, জোচ্চুরি, বাটপাড়ী যে যেদিক দিয়ে পারে তা থেকে আত্মসাৎ করে। আর নিরপরাধ প্রজাদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তাদের চালান দেয় রাজার কাছে বিচারের জন্যে।

যেমন রাজা, তাঁর শাসন করার পদ্ধতিটাও তেমনি চমৎকার। যে অপরাধী তাকে একটা কাঠের বাক্সের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে বলা হয়। সেই বাক্সের উপরে যে গর্ত তার মধ্যে থেকে একটা ছোট কাগজের টুকরো টেনে বার করতে।

সেই কাগজে যে লেখা উঠবে তাই হবে রাজার বিচার। 'বাঁচা' আর 'মরা' এই দু'রকমের কথা দু'টুকরো কাগজে লেখা থাকে, যার ভাগ্যে যা উঠবে, তাকে মেনে নিতে হবে তাই। এর ওপর আর কোন আপীল নেই।

বিচারের নাম শুনলে তাই আতঙ্কে শিউরে ওঠে সকলে।

একদিন এক ধনী বস্ত্র-ব্যবসায়ীকে রাজার সামনে এনে হাজির করেন মন্ত্রী। বললে, হুজুর, এর অপরাধ সাংঘাতিক। এ রাজশুল্ক ফাঁকী দিয়েছে, যতটা দেবার কথা তার অনেক কম দিয়েছে।

এ গুরুতর অপরাধ সন্দেহ নেই। রাজা তাই সঙ্গে সঙ্গে তার বিচারের দিন ধার্য করে আসামীকে হাজতখানায় বন্দী করে রাখতে হুকুম দিলেন।

কিন্তু মুস্কিল হলো এই যত বিচারের দিন ঘনিয়ে আসে, তত মন্ত্রীর বুকের ভিতরটা দুর দুর করে।

কি জানি যদি তার ভাগ্যে ওঠে 'বাঁচা'। তাহলেই ত আসামী রাজার কাছে সব কথা ফাঁস করে দেবে!

মন্ত্রী যে তার কন্যার বিবাহের সময় অনেক টাকার বস্ত্র এই

মহাজনের কাছ থেকে ধারে কিনেছিল এবং ছমাস এক বছর করতে করতে প্রায় আড়াই বছর কেটে গেলেও সে দেনা শোধ করেনি— উপরন্তু সেই টাকার জন্যে তাগাদা করাতে মন্ত্রী ওর ঘাড়ে মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে তাকে এইভাবে ফাঁসীতে লটকাবার মতলব করেছে, রাজা সে কথা জানতে পেরে যাবেন।

তাই এই আপদ একেবারে নিষ্কণ্টক করার জন্যে মন্ত্রী গোপনে সেই বাক্সরক্ষককে ঘুষ খাওয়ালে। বললে, ওর ভিতরের দুটো কাগজেই 'মরা' এই কথাটা লিখে দিতে হবে, তাহলে যে কাগজই সে তুলুক মৃত্যু একেবারে সুনিশ্চিত। মন্ত্রীর ইচ্ছামত কাজ বাক্সরক্ষক করলে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা লতলবও তার মাথায় গেল।

ঘুষখোরের কি লোভের সীমা আছে! তাই তখনি কারাধ্যক্ষের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সে বন্দীর সঙ্গে গোপনে গিয়ে সাক্ষাৎ করলে এবং তার হাতের বহুমূল্য হীরার আংটিটার বিনিময়ে তাকে মন্ত্রীর সেই কৌশলের কথাটা ফাঁস করে দিয়ে এলো।

বিচারের দিন সকালে বন্দীকে এনে দাঁড় করিয়ে তার সামনে সেই বাক্সটা রাখা হলো।

রাজার হুকুমে ঘাতক আগে থেকেই তার পাশে হাজির ছিল। মন্ত্রীর বুকের মধ্যে আনন্দের তুফান উঠতে লাগল।

বন্দী প্রথমে ভগবান ও তারপর রাজা ও উপস্থিত জনমণ্ডলীকে প্রণাম করে একখানি কাগজ টেনে নিলে বাক্সটা থেকে। কিন্তু মরা এই কথাটাকে দেখেই সে তৎক্ষণাৎ কাগজটা মুখের মধ্যে পুরে চিবিয়ে খেয়ে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে রাজার দুই চোখ ক্রোধে জ্বলে উঠলো এবং জনতাও হৈ-হৈ করে উঠলো।

তখন হাত জোড় করে বন্দী রাজাকে বললে, হুজুর, ভয়ে আমি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারিয়ে এই গর্হিত কাজ করে ফেলেছি, এর জন্যে ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে।

আর একটি কাগজ ত এখনো অবশিষ্ট রয়েছে—সেটা তুলতেই ত আগেরটাতে কি লেখা উঠেছিল বুঝতে পারা যাবে।

সবাই সায় দিয়ে উঠলো, বললে, সাধু প্রস্তাব। শুধু মন্ত্রীর মুখ ভয়ে পাংশু বর্ণ ধারণ করে।

বন্দী এবার কাগজখানি বাক্স থেকে বার করে সকলের সামনে উঁচু করে তুলে ধরায় সবাই দেখলে তাতে 'মরা' এই কথাটা লেখা।

কাজেই পূর্বের কাগজটা যে 'বাঁচা' লেখা ছিল এ বিষয়ে সকলের সঙ্গে রাজা একমত হয়ে তখনই বন্দীকে মুক্তি দিলেন।

শুনলে তো?

আজব দেশের আজব রাজার কাণ্ড। উল্টো বিচার সবটাই যেন উল্টো তাই না?

সমাপ্ত